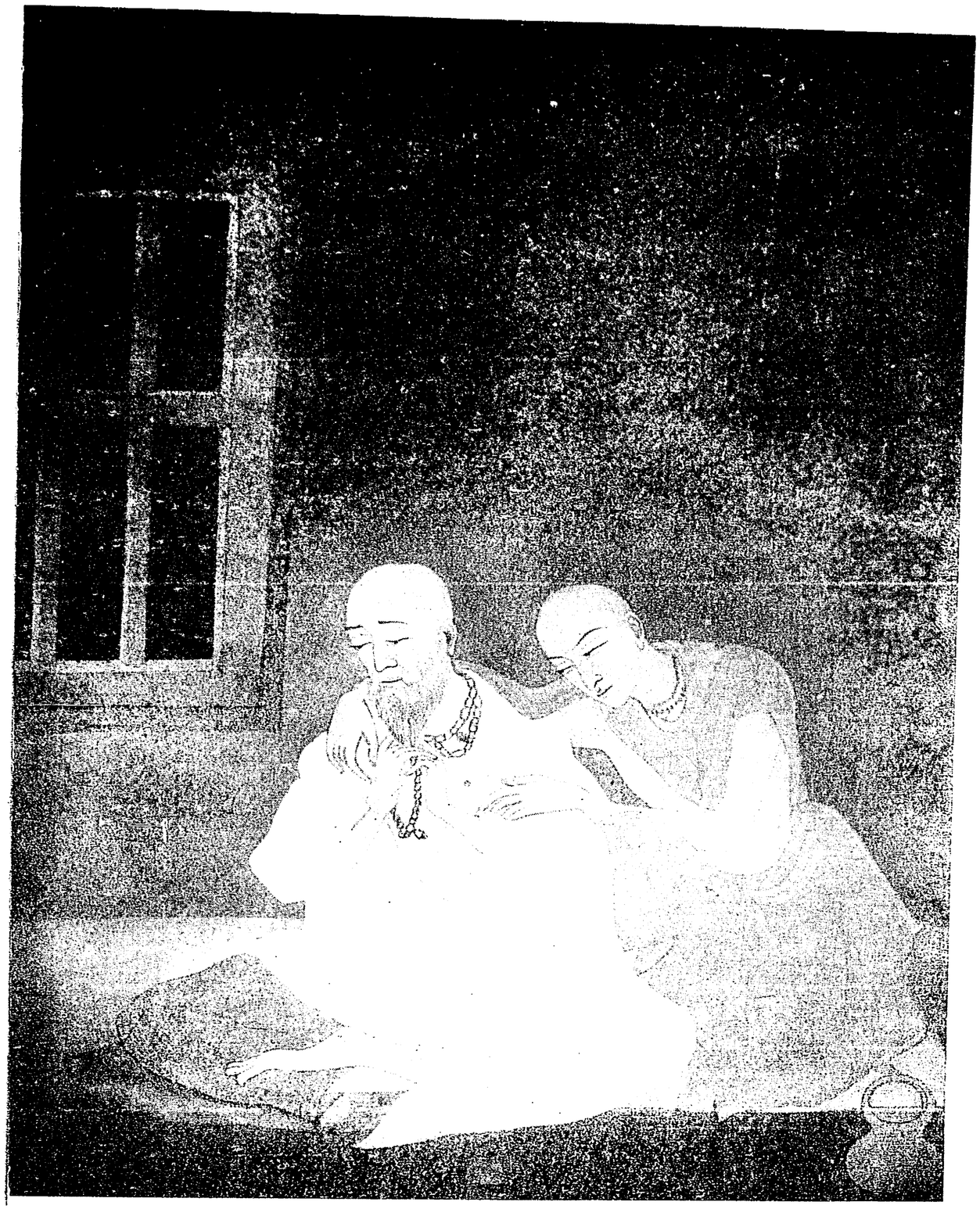

শ্রীচৈতন্য ও হরিদাস

চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে

নারায়ণ

৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩২৭ সাল

টঙ্

(দরবেশ)

ওরে মন, ওরে আমার
আপ্‌না-ভোলা মন,
আর কতকাল কঠিন ভুঁয়ে
কর্‌বে বিচরণ ?
উঁচু নীচু পথের মাঝে
চল্‌তে গিয়ে ব্যথা বাজে,
কাঁটার ঘায়ে ছিন্ন পায়ে
রক্ত বরিষণ।

এইবারে তুই আস্‌মানেতে
বেঁধে নিয়ে টঙ্,
চুপটি করে' দেখ্‌না বসে'
দুনিয়ার কি ঢঙ্।
আকাশ হতে যাবে দেখা
মিলিয়ে যাওয়া সীমার রেখা,
সকল জমীন্ হয়ে অসীম
কর্‌বে আলিঙ্গন।

দ্বিদল কমল।

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।]

এক রাজা ছিলেন ; সেই রাজার দুয়ো সুয়ো কুয়ো প্রভৃতি ক'টী যে রাণী ছিলেন জানি না, কিন্তু একটী যে পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল এ বিষয়ে কারো সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। কারণ এই গল্পটী (গল্প নয়) তারই বিষয়ে লিখিত। এবং যা লিখিত তা নিশ্চয়ই শ্রুত। আবার যা শ্রুতি তা নিশ্চয় ধ্রুব সত্য। অতএব প্রমাণ হল যে এক রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। এ প্রমাণ যে অগ্রাহ্য করবে শ্রুতিকে বিশ্বাস না করার দরুণ এই আর্য্যের দেশ আর্য্যাবর্ত্তে তার স্থান নেই ;—সে হয় কিষ্কিন্ধ্যায় যাক, না হয় সাগর ডিঙ্গিয়ে মরুক গে।

এখন, সেই রাজকন্যাটী যখন পরমাসুন্দরী তখন কাজে কাজেই সেই মেয়ের উপযুক্ত বর জোটান দায় হয়ে উঠ্‌ল—বাপের পক্ষে হোক্ না হোক্ গল্প লেখকের পক্ষে ত বটেই। কত দেশের কত রাজপুত্র এসে ঘুরে গেল, কত মন্ত্রি-পুত্র, কোটালের পুত্র, সদাগরের পুত্র, এসে কত ষড়যন্ত্র করে গেল। কত রাক্ষস খোক্কস্ বেঙ্গামা বেঙ্গমী কত পক্ষিরাজ ঘোড়া আর তালপত্র খাঁড়া রাজকন্যার দরজায় এসে ডিগবাজী খেলে, কিন্তু সেখানে প্রবেশ করতেই পারলে না।

কেন ? ঐ ত তোমাদের দোষ ! 'কেন', জিজ্ঞাসা কর কেন বাপু—যারা 'কেন' জিজ্ঞাসা করে তারা গল্প শুনবার উপযুক্তই নয়। যারা গল্প শুনতে 'কেন', জিজ্ঞাসা করবে তাদের সব কলেজে পাঠিয়ে দাও, সেখানে গিয়ে ক্রমাগত কেন কেন করুক গে।

যা হোক, রাজকন্যার বর ত আর জোটে না। কেন ? আবার 'কেন' ? দূর হোক, বাপু, তবে উত্তরই দিই,—কিন্তু খবরদার আর কাউকে বল না। শোনো, কাণে কাণে বলি—মেয়েটী একটী স্বপ্ন দেখেছিল !

হাসছ ? ভাবছ এই বুঝি একটা ভারী গোপন কথা ! স্বপ্ন ত সবাই দেখে, তা আবার এত কাণে কাণে বলতে হবে নাকি ?

ওহে তোমরা ছেলে মানুষ, জান না, এ এমন দেশ যেখানে এ সব কথা কাণে কাণে বল্‌তে হয়, নইলে সব বিফল হয়। মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড় ফুক্ সমস্তই কাণে কাণে বল্‌তে হয়, নইলে কুকুর বেড়াল শুনতে পেলেও যে, সব বেফাঁস হয়ে

যায়। যদি বলবার দরকার হয় 'ফুস্‌টী আর ফাস্‌টী ধানটীর মধ্যে তুষটী' তবু কাণে কাণে বলতে হবে, নইলে সব মাটী। স্বপ্ন যে ফলবে না, বুঝছ না ?

শোনো না, মেয়েটী একটী স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু এমন স্বপ্ন, যার জন্য ঐ অত বড় রাজার অত বড় রাজ্যটার ইয়া ইয়া টাকী থেকে আরম্ভ করে ধান গাছের শীষ, নৌকার হাল, বলদের ল্যাজ সমস্তই নড়ে উঠেছিল। কিন্তু কি স্বপ্ন বল্ দেখি ?

পারলে না ? পারবে কেন ? একি যে সে স্বপ্ন ? একি যার তার দেখা স্বপ্ন ? এ যে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যার পরম সুন্দর মগজে হঠাৎ দেখা দিয়েছিল। তোমাদের মগজে তা ধরা দেবে কেন ?

তবে বলি শোনো, রাজকন্যা স্বপ্ন দেখলে,—একটী অদ্ভুত পদ্ম অসম্ভব জলে ভাসতে ভাসতে অকারণে তাঁর বুকে এসে ঠেক্‌ল ! রাজকন্যা পদ্মটী হাতে নিয়ে দেখে তার মোটে দু'টী পাপড়ী। সোণার বরণ পাপড়ী দু'টীর মধ্যিখানে একটী মাত্র অপরূপ কেশর উর্দ্ধদিকে উঠেছে। আর পদ্মটীর এমনি গুণ যে পদ্মটী হাতে নেবা মাত্র রাজ কন্যা যেন অজ্ঞান হয়ে গিয়ে সেই পদ্মটীর মধ্যে মিলিয়ে গেল। তার পর সেই কেশরটীর মধ্য দিয়ে কোথায় যে কোন অলোকপথে চলে গেল, সে কথা আর জেগে উঠে সে মনেই করতে পারলে না।

তার পর, জেগে উঠে, এই যে কান্না জুড়ে দিলে তার আর বিরাম নেই। বালিস ভিজল, বিছানা ভিজল, এমন কি শেষে তার মা বাপের মনও ভিজে পাঁক হয়ে গেল। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন, মেয়ের এই স্বপ্নলব্ধ দুই পাঁপড়ীর পদ্ম যে এনে দেবে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবেন—অবশ্য অর্দ্ধেক রাজত্ব ত যৌতুক আছেই।

এখন বল দেখি তোমরা সেই দুই পাপড়ীর পদ্ম কোথাও দেখেছ ? এতক্ষণ যে হাসছিলে, হাস দেখি এইবার ? চালাকী !—একি যে সে স্বপ্ন ?

যাক আর ভেবে কাজ নেই, কারণ ভেবে কোনো ফল নেই। এতো আর ইস্কুল কলেজ ছাড়া নয় যে এক কথায় ঝুলি ঘাড়ে করে বেরিয়ে নন-কো-অপারেসনের সব মীমাংসা সমাধান করে ফেলবে ? বাপু, এ হচ্চে দ্বিদল পদ্ম, এবং এক রাজকন্যার মগজে গজিয়ে উঠেছে। একে কি সহজে পাওয়া যায় ?

একে সহজে পাওয়া যায় না, তাই সেই রাজার রাজ্যের মন্ত্রী হতে যন্ত্রী, সরকার হতে কর্ম্মকার সকলের মাথা গরম হয়ে উঠল, কিন্তু এর সন্ধান কেউ

নির্ণয় করতে পারলেনা। সারা রাজ্য ভরে একটা সন্দেহ একটা তর্ক একটা ভয়ের ঢেউ উঠলো—কিন্তু পদ্মটী কেউ মেলাতে পারলে না।

তখন রাজপুত্ররা বেরিয়ে গেলেন পক্ষিরাজে চড়ে, মন্ত্রি-পুত্ররা বসে গেলেন মহু যাজ্ঞ-বল্ক পেড়ে, সদাগরের পুত্ররা ভাসলেন ময়ূরপংক্ষী সাজিয়ে, আর কোটালের পুত্রটা তালঠুকতে লাগলেন তালপত্র খাঁড়া ঘষিয়ে মাজিয়ে। কত হাত চালান, নল চালান, কত উর্দ্ধঃপাতন, তির্য্যক পাতন, কত দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ, কিছুতেই সেই দ্বিদল পদ্মটীর আর খবর মেলেনা। কত রত্ন দ্বীপ মণিদ্বীপের খবর মিলল, মণি রত্নে রাজার ভাণ্ডার ভরে উঠল কিন্তু যার জন্যে সব বিফল সেইটাই মিললনা—তাই রাজকন্যার চোখের জল আর থামল না। কত রাজপুত্র কত সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, কত সোণার পাহাড় মুক্তোর ঝরণা রূপোর নদীর খবর নিয়ে এল, কিন্তু স্বপ্নের ফুলটী স্বপ্নতেই থেকে গেল। কত রাক্ষস খোক্কস গন্ধর্ব্ব কিন্নরের খবর নিয়ে রাজকন্যার কাছে তারা এল কিন্তু রাজকন্যার চক্ষুদুটী জলে ভরেই রইল, কারু সঙ্গে চার চক্ষে আর মিলনই হল না। কত সদাগরের পুত্র পদ্ম মহাপদ্ম খর্ব্ব নিখর্ব্বের খবর দিলে, কিন্তু রাজকন্যা মুখই তুলে চাইলে না। কত মন্ত্রি-পুত্রেরা চতুর্দ্দল অষ্টদল সহস্রদলের বড় বড় শ্লোক শুনিয়ে গেল কিন্তু সেই পদ্মপত্রাক্ষীর নয়নপদ্মের দৃষ্টি কোন্ দুটী সোনার দলের আশায় যে মুদিত হয়ে রইল তা কেউ বলতেই পারলেনা। কোটালের পুত্ররা খাঁড়া ঢাল ঝাকালে 'ইয়া করেঙ্গা' 'উয়া করেঙ্গা' 'মারেঙ্গা' 'কাটেঙ্গা' 'কুকুর মেরে ফাঁসী যাঙ্গা' করলে কিন্তু স্বপ্নের পদ্ম স্বপ্নের অলোকেই রয়ে গেল। সে বুঝি আর বাইরে ধরা দেয় না! হায় হায় কি হবে? কে রাজকন্যার সেই স্বপ্নের ধন এনে দিয়ে রাজ্যরক্ষা করবে? সেই অরুণ রাঙ্গা দ্বিদল কমলে একটী কেশর কে দেখাবি গো, কে দেখাবি?

রাজ্য ভরে এই শব্দ 'কে দেখাবি গো—কে আছিস!' সমস্ত রাজ্য মাথা নীচু করে বল্লে, কেউ না। লজ্জায় উত্তর হতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সমস্ত দেশের আকাশ বাতাস পর্য্যন্ত রাঙ্গা হয়ে উঠল। এ দারুণ লজ্জা হতে কেউ কি এদের রক্ষা করতে পারবে না?

হেন কালে এক রাখাল এসে হাজির হল। শুনে হাসছ? হাসগে—রাখাল কিন্তু এল। সে চরাচ্ছিল গরু—তার গায়ে ছিল একটা উড়ুনি, পরনে ছিল ধড়া, হাতে ছিল একটা বাঁশের বাঁশী। সে ছিল মাঠে—তার মুখে পড়ে ছিল

প্রভাত সূর্য্যের আলো, তার বুকে এসে লেগেছিল দূরদূরান্তের হাওয়া। আর কাণে এসে বেজেছিল একটা শব্দ—তার বাঁশীর তাইরে নারের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠেছিল একটা শব্দ—আয়রে আয়। তাই সে এসেছে।

সে রাখাল, তাই সে অমনি ছুটে এসেছে, কোনো দ্বিধা করে নি—কোনো বাধা মানেনি। কোনো শাস্ত্র শস্ত্র যন্ত্র তন্ত্রের পরামর্শ নেয়নি। সে তার মাঠের হাওয়ার মত আলোর মত গানের মত স্বাধীন, তাই সে এসেছে। সে রাখাল তাই রাজার সিংদরজার বাধা সে মানলে না, সিপাই সান্ত্রীদের দিকে সে চাইলে না, মন্ত্রী যন্ত্রীর শ্লোক সে শুনলে না—একেবারে রাজবাড়ীর সাত মহল সাত দরজা পার হয়ে সে রাজকন্যার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে 'আমি এনিছি গো এনিছি, পদ্মের খবর এনিছি।

রাজকন্যা মুখ তুলে চাইলে, অমনি চার চক্ষে মিলে গেল—জল মুছে রাজকন্যা হেসে বল্লে, 'ও গো বীর এসেছ? এনেছ? কৈ দাও? কৈ আমার দ্বিদল কমল?'

রাখাল বল্লে—'একটী দল তুমি আর একটী দল আমি—তোমার আমার এই সত্যিকার মিলন হতে যে ইচ্ছা কেশর—একটী মাত্র ইচ্ছা কেশর দেখা দিল সেই ইচ্ছেকে ধরে কোন্ লোকে যে আমরা যাব তাত' কাউকে বলব না।'

আমার কথাটী—এঁ্যা ফুরল না? আরো আছে নাকি? আচ্ছা তবে কি আছে তা তোমরাই বল? নটে গাছ মুড়ুল তবু আমার কথা ফুরুবে না? তবে নাই ফুরোক, তবে যেন নাই ফুরোয়। তবে যেন এমন করে সাহস করে বীরের মত বনের রাখাল আমার রাজকন্যার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে "আমি এসেছি গো এসেছি। আমি তোমায় ভাল বেসিছি সত্যি ভাল বেসেছি।" আর সেই সত্যলোকের মানুষটীর কথায় যেন আমার রাজকন্যার দ্বিদল কমল ফুটে ওঠে। যেন সেই মন কমলের ইচ্ছে কেশর হেলে দুলে বেড়ে উঠে এ লোক হতে আলোক পথে আমার রাজকন্যাকে আলোকপানে নিয়ে যায়। ওগো তোমরা আশীর্ব্বাদ কর আমার রাজকুমারী যেন সেই রাখালকে পায় গো পায়—যার প্রেমের বাঁশীর পাঁচন ছুইয়ে দিতেই লোহার কপাট খুলে যায়, পাথরের দেয়াল পড়ে যায়, বাহির ভেতর এক হয়ে যায়, পাখী গায়, ফুল ফোটে, হাওয়া বয়, হাসি ছোটে, আনন্দে ভর পুর হয়ে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম গেয়ে ওঠে মেতে ওঠে।

বাস্, আমার কথাটীও ফুরুল না, নটে গাছটীও মুড়ুল না, হল ত?

পেটের দায়।

[শ্রীকালিদাস রায়।]

বলেছিলাম 'তোমার ছেলে অকলঙ্ক সোনার চাঁদ',
মিথ্যেকথা! গোবর-গণেশ, আহা কিবা রূপের ছাঁদ।
বলেছিলাম মেয়েগুলি লক্ষ্মী যেন, সত্য নয়,
রক্ষাকালীর বাচ্ছা তারা,—ঠিক তাহাদের পরিচয়।
রূপে তুমি মদন-মোহন বলেছিলাম কতবার,
সত্য তুমি যমের বাহন এমনি তুমি কদাকার;
আয়নাতে মুখ দেখলে পরে থাকবে না সন্দেহ তায়
সে সব কথা বলেছিলাম কেন জান? পেটের দায়।

বলেছিলাম পুণ্যে যেন স্বয়ং তুমি যুধিষ্ঠির
জনক রাজার মতন তুমি মহাপুরুষ ধর্ম্মবীর,
মিথ্যা কথা! তুমি একটি ভীষণ রকম পাষণ্ড
অত্যাচারী দুশ্চরিত্র ভোগগর্দ্দভ বা ষণ্ড।
বলেছিলাম দাতা তুমি বলির মতন গুণধাম
আরে রামঃ! সকাল বেলায় কেউ করে না তোমার নাম!
তোমার বাড়ী হতে দেখি পিঁপড়ে গুলোও কেঁদে যায়
সে সব কথা বলে ছিলাম কেন জান? পেটের দায়।

বলেছিলাম জ্ঞানী তুমি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ
তুমি গেলে পূরণ করতে পারবে না কেউ তোমার পদ।
মিথ্যে সবি! তোমার মতন মূর্খ নাইক দুনিয়ায়
অকাল কুষ্মাণ্ড তুমি গর্ভস্রাবও বলা যায়।
গিন্নী তোমার অন্নপূর্ণা? নেইক এতে সত্য লেশ,
গয়নাতে গা সন্দেশে পেট ভরতে তিনি পারেন বেশ;
লক্ষ্মীর হাতে আড়ি কিনা একটী মুঠোও কেউ না পায়;
তবে যে সব বলেছিলাম, সেটা কেবল পেটের দায়!

বলেছিলাম তোমায় আমি আভিজাত্যে পুরন্দর
সমাজপতি মহাকুলীন মহাকুলের ধুরন্ধর।
আরে রামঃ! তোমার বাড়ী পা ধুলে বা পাতলে পাত
নেহাৎ যে জন অনাচারী থাকে নাক তারো জাত।
তবে যে ঐ পোলাও খেতাম করে আমার মাথা হেঁট
সে এই 'দগ্ধোদরস্যার্থে' অর্থাৎ ভরতে পোড়া পেট।
অনেক মিথ্যে বলিয়াছি তৈল ঢালি তোমার পায়
কেন বলেছিলাম জান? শুদ্ধ কেবল পেটের দায়!

জড় বিজ্ঞান ও জীবাত্মা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।]

মিডিয়ম দেহে ভরপ্রাপ্ত অদৃশ্য চৈতন্যসত্তার এই লিখন ভাষণ কাজ ছাড়া আরো দু এক শ্রেণীর অলৌকিক ঘটনা আছে যা হইতে প্রেত অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। (ক) মৃত্যুকালে বা পরেই মৃতের কোন কোন প্রেতরূপ দূরস্থ আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে দেখা দেয়। এমন কিম্বদন্তী সব দেশে ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। সভা এমন সব অনেক দৃষ্টান্ত সাক্ষপ্রমাণ যোগে সত্য বলিয়া বুঝিয়া লিপিজাত করিয়াছেন। এই যে মৃতের প্রেত দর্শন ইহা দ্রষ্টার ভ্রমজনিত মায়াদর্শন না সত্যই মৃতের প্রেতমূর্ত্তির বাস্তবদর্শন? ব্যক্তির মৃত্যু ও প্রেতদর্শন এই দুই ঘটনায় কি কোনো কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে? না কাক ওড়া ও তালপড়ার মত দৈবঘটিত সময় মিল? পণ্ডিতরা হাজার হাজার সত্য দৃষ্টান্ত লইয়া probabilityর অঙ্ক কসিয়া দেখিয়াছেন দৈবমিল নয়। তবে কি কার্য্য কারণ মিল?—মৃতের আত্মা দেহমুক্ত হইয়া প্রিয়জনকে দেখা দিয়া গেল। এই সিদ্ধান্তই সমীচীন, সঙ্গত ও বিজ্ঞান অনুমোদিত। এসম্বন্ধে সভার বিচক্ষণদের মত তাই অর্থাৎ মৃতের আত্মাকেই দ্রষ্টা দেখে। তবে এই দর্শন বাস্তবরূপের না মায়াবী রূপের তা লইয়া মতভেদ আছে।

(খ) বাড়ী বিশেষে ভৌতিক উৎপাত। সভা এ শ্রেণীর কতকগুলি ঘটনা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ভৌতিক উৎপাত মিথ্যা জনরব বা অজ্ঞানীর কুসংস্কার নহে। **ভৌতিক উৎপাত** গবেষণা করিবার ভার যে শাখা সমিতির উপর পড়ে বিদুষী মিসেস্ সেজউইক (দার্শনিক পত্নী) উহার সভাপতি। তিনি সব সভ্য অপেক্ষা ঘোরতর সন্দেহবাদী—অন্য কোনো ব্যাখ্যার তিলমাত্র পথান্তর থাকিলে তিনি প্রেতবাদ গ্রাহ্য করেন না। তিনিও বলেন—সমস্ত ঘটনা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া আমার মনে হয় আপাততঃ বিশ্বাস করিতে আমরা বাধ্য যে ভৌতিক উৎপাত সত্য এবং ভুতুড়ে বাড়ীর অস্তিত্ব প্রামাণিক (S. P. R. proceedings V. I, III page 142).

(গ) প্রেত কর্ত্তৃক জড় দ্রব্যের চলাচল, আবির্ভাব, তিরোভাব।—বিখ্যাত মিডিয়ম হোমস্‌কে লইয়া বিলাতে বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধর W. Cookes, Sir A. R. Wallace প্রভৃতি বহু পণ্ডিত ও গণ্য মান্য বিশ্বাসী লোক যে সব অদ্ভুত পরীক্ষা করেন তাহাতে চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে এ সব ব্যাপার সত্যই ঘটে ও ঘটিয়াছিল।

কয়েক বৎসর আগে ইংলণ্ডের বিখ্যাত স্বনামধন্য পদার্থ-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Lord Rayleigh প্রেততত্ত্ব সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ করেন তাহা পড়িলে পাঠক দেখিবেন এই জাতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভৌতিক ঘটনা তিনি কিরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলেন এবং কি মত দিয়াছিলেন।

Richet, Lodge, Lombroso, Morsalli, Wallace, Crookes, De' Morgan প্রভৃতি সন্দেহবাদী জড় বৈজ্ঞানিকরা সরল প্রাণে সজোরে বলিতেছেন 'এই সব অতিপ্রাকৃত ঘটনা সত্য—তবে এদের প্রাকৃত কারণ কি কি নিয়মে ঘটিতেছে তাহার কোনো আন্দাজই আমাদের জ্ঞানের ধারণাতীত! তবে ঘটনা অত্যন্ত সত্য—এতে কাহারো দ্বিমত নাই।'

নানাজাতীয় এইরূপ সাক্ষ্য ও প্রমাণ সত্ত্বেও—পণ্ডিতদের মধ্যে দুইটী দল দুই ভিন্ন মতবাদ দিয়া অলৌকিকের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

এক দল বলেন—প্রেতবাদই প্রকৃষ্ট ও সন্তোষকর কারণ ব্যাখ্যা। যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ঘটনা সুন্দর রূপে ব্যাখ্যাত হয় দেহাতিরিক্ত সজ্ঞান আত্মার অস্তিত্ব মানিলে। এবং সমস্ত ঘটনাতেই এমনি দেহমুক্ত আত্মার সজ্ঞান কাজ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

দ্বিতীয় দল প্রেতবাদ সঙ্গততর মত মানিলেও বলেন যদি মিডিয়মের সুপ্ত চৈতন্য দিয়া ব্যাখ্যা করা যায় তাহা হইলে আর প্রেতবাদে যাওয়া কেন? ইহাদের যুক্তি এই—অতীন্দ্রিয় উপায়ে এক চিত্ত অন্য চিত্তের ভাব জানিতে পারে, অন্য চিত্তে ইচ্ছামত ভাব জাগাইতে পারে। জীবিত মানব-চৈতন্যের এ শক্তি পরীক্ষা-প্রমাণিত সত্যতত্ত্ব; তার পর জীবিত মানব চৈতন্যের আর একটা ধর্ম্ম আছে—উহার সমগ্র-অংশের মাত্র একটু ভগ্নাংশ আমাদের মস্তিষ্ক যোগে প্রকাশমান, বাকীটা সুপ্ত বা অব্যক্ত; এই অব্যক্ত-চৈতন্য (Subliminal Self) অসীম শক্তি ও সম্পদশালী। দেশকাল অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করে; মোহাবস্থায় (Hypnotic) মুগ্ধ মিডিয়ম তার পরিচয় দেয়। সজ্ঞান অবস্থাতেও এই অব্যক্ত চৈতন্য আমাদের অজ্ঞানে কাজ করে; অনেক অজানা খবর জানায়, অশ্রুত বাণী শোনায়, প্রতিভাবান্ শিল্পী ও সাহিত্যিক, যোগী মুনি, ধ্যানী জ্ঞানী সাধু সন্ন্যাসী সবার জীবনে ও কাজে তার পরিচয় পাই। হইতে পারে মিডিয়মের এই জীবন দেবতার মত গুহাশায়ী অব্যক্ত চৈতন্য Telepathy বলে মৃত বা জীবিত, দূর বা নিকটস্থ সকলের গুপ্তকথা, গুপ্তকাজ দেখিতে শুনিতে পায় এবং পাইয়া প্রকাশ করিতেছে? তবে যে অব্যক্ত বক্তিবিশেষের আত্মা বলিয়া পরিচয় দেয়, ও তার ধর্ম্ম-কর্ম্ম আচার ব্যবহার নকল করে, সেটা হয় তো স্বপ্নের ক্রিয়ার মত? আমরা স্বপ্নে যেমন মিথ্যা সৃজন করি, নাট্য অভিনয় করি তেমনি কিছু! যদি তাই হয় তবে ধ্রুব পরিচিত জ্ঞানিত কারণ ছাড়িয়া অধ্রুব অজ্ঞাতকে টানিয়া আনি কেন? টেলিপ্যাথী ও অব্যক্ত-চৈতন্য আমাদের পরীক্ষা-প্রেক্ষণ লব্ধ তত্ত্ব; প্রেত তাহা নহে।

প্রেতবাদীরা বলেন—"টেলিপ্যাথী দিয়া ব্যাখ্যাত হয় না এমন সব ঘটনার কি হইবে? তা ছাড়া ভুতুড়ে বাড়ী; মৃতের প্রেতরূপ দর্শন; প্রেত কর্ত্তৃক জড়দ্রব্যের চলাচল এ সব তো Telepathy দিয়া ব্যাখ্যা হয় না?

Telepathy-বাদীরা বলিবেন, এসব ঘটনা এখনো বিশ্বাসের মত প্রমাণিত হয় নাই। উহাদের সংখ্যা এত অল্প যে উহা হইতে একটা সিদ্ধান্ত ন্যায়সঙ্গত নহে।

মোট কথা এই বাদানুবাদের শীঘ্র শেষ হইবে না। কোন্ দল জয়ী হইবেন তাহা বলা দুষ্কর। তবে এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত যত সাক্ষ্য প্রমাণ নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিলে মনে হয়—প্রেতবাদই সহজতর সঙ্গততর ও সুবিধাজনক

ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ। সভ্যদের মধ্যে বড় বড় নামজাদা বেশীভাগ পণ্ডিতই প্রেতবাদের সমর্থনকারী।

W. Crookes; A. R. Wallace; Barrett; Myers; Lodge; Hodgson; Hyslop; Flmnanon; Lambroso, Richet, Shiaparelli; Sidgwick; A. Balfour; H. Bergson; W. James প্রভৃতি এই যে বিজ্ঞানাকাশের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কগণ ইহারা প্রেতবাদই গ্রহণ করিয়াছেন।

বিখ্যাত শারীরতত্ত্ববিৎ Arthur Hill প্রথমে টেলিপ্যাথীবাদী ছিলেন; পরে বহুবৎসরব্যাপী স্বাধীন গবেষণার ফলে প্রেতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

চিৎতত্ত্বসভা মানবজাতির জ্ঞানের প্রসারের জন্য তমসাচ্ছন্ন ভয়াবহ অজ্ঞেয় এই অলৌকিকের রাজ্যে সত্যের বর্ত্তিকা লইয়া চলিয়াছেন—জড়বৈজ্ঞানিক তাঁহার Mechanical কারণ ব্যাখ্যার দ্বারা চিৎ-রাজ্যের কোনো নিরাকরণ করিতে না পারিয়া এই দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছেন; কিন্তু সব কালেই যেমন দুঃসাহসিকের প্রাণপণ সাধনাকে তুচ্ছ করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বা ভয় দেখাইয়া নিরুৎসাহ করিবার লোকের অভাব হয় না; এ যুগে ও এদেশে ওদেশে সর্ব্বত্রই তেমন লোকের অভাব নেই। নব-পথের এই পথিকদের প্রতিবাদী দুই শ্রেণীর। একদল স্বজাতীয় পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক তাঁহারা মামুলী পুরাতন পোষা মতকে ছাড়িতে রাজি নহেন। নিজেদের ধারণা ভ্রান্ত বা জ্ঞান অসীম ইহা তাঁহারা না মানিয়া বিজ্ঞানেরই দোহাই দিয়া নূতনের বিরোধপন্থী। ইহাদের মনে কু নাই। কপালে ঘটিলে মত বদলাইতে বাধ্য হইবেন। দ্বিতীয় দল—অজ্ঞানী আনাড়ীর দল যাঁহারা—খোঁজ খপর না জানিয়া উদ্দেশ্য মৎলব না মানিয়া কর্ম্মীর নিঃস্বার্থ কর্ম্মে স্বার্থ বা সুখের গন্ধ দেখেন। ইহারাও নিজ মতের অন্ধ সেবক, অহমের পূজারী। বিলাতের একদলের উদ্দেশ্যই হইতেছে এই সাধু চেষ্টাকে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ ও হেয় করা। সব দেশেই এ শ্রেণীর লোক আছে।

যাঁহারা এ দু' দলের কোনো দলের নন, তাঁহাদেরও অনেকে এ সম্বন্ধে উদাসীন। হঠাৎ খেয়াল বশতঃ কথা উঠিলে ইহারা বলেন—"পরকালের জন্য মাথা ব্যথা কেন? everything in its time—একালে একালেরই কাজ চলুক।" যে সব ঐহিক কর্ম্মী সত্যই দেশের ও দশের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন তাঁহাদের একথা বলা সাজে—কিন্তু যাঁহাদের ঐহিক কাজ শুধু হাইতোলা ও

তুড়ী দেওয়া আর জীবধর্ম্ম পালন করা তাঁহাদের এসব সাধু চেষ্টা বা ব্রত সাধনে কোনো কথা না বলাই ভাল। কেন না এরূপ কাজে লোকের মনে সত্যানুরাগে বাধা পড়ে। আজ যেটা ইহাদের ধারণাতীত বলিয়া উদ্ভট ও অসম্ভব মনে হইতেছে কাল সেটা জগতের পরম জ্ঞান সম্পদে দাঁড়াইতে পারে। "for nothing is that errs from Law"—নিয়মে ব্যতিক্রম বলিয়া কিছু নাই।

বিলাতে আর এক শ্রেণী প্রেত তত্ত্বানুসন্ধানের শত্রুতা করিতেছেন। ইহারা গোঁড়া ধর্ম্ম যাজকের দল। ইহাদের আপত্তি এই যে বাইবেলে প্রেত ব্যাপার লইয়া আলোচনা নিষিদ্ধ সুতরাং এসম্বন্ধে সাধারণের হস্তক্ষেপ অধর্ম্ম-জনক। ইহাদের যুক্তিতর্ক এতই হাস্যোদ্দীপক যে কাহারো প্রতিবাদ করা কেবল কালি খরচ ও কাল অপব্যয়।

দেহান্তে আত্মার সজ্ঞান অস্তিত্ব, ইহার ভাগ্য, কর্ম্মাকর্ম্ম গতিবিধি যদি বিজ্ঞানবলে প্রমাণিত হয় তাহা হইলে মানব জাতির পক্ষে যে কি অসীম মঙ্গল সাধিত হয় তাহার বর্ণনা অসম্ভব। পরকালে আত্মার ক্রমোন্নতিতে মানুষ যখন শাস্ত্র অনুযায়ী বিশ্বাস করিত তখন মানুষের নৈতিক জীবন অনেক উচ্চাবস্থায় ছিল; পরকালের ভয়ে সে ইহকালকে গঠিত করিত। পুণ্যের একটা প্রবল তাড়না ছিল। এখন মানুষ জড়বিজ্ঞানের নীতিহীন নাস্তিক্য শিক্ষার ফলে ইহজীবনের সুখকে সার করিয়াছে, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, ঊর্দ্ধগতি এসব আর তার গণনার মধ্যে নাই। পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশাইবে, এবং পঞ্চভূত-বিকৃত চৈতন্য—heat, light, electriicty তে লয় হইবে যখন, তখন আর কে কার? মার কাট খাও, বড় হও—সংসার যখন চামুণ্ডারূপিণী প্রকৃতিরই শ্মশানলীলা, তিনি যখন 'red in tooth and claw;' তখন কিসের ত্যাগ? কার জন্যে ত্যাগ? ভোগই মার বা শয়তান!

আর বিশ্বপ্রকৃতি যদি তাই না হয়? যদি একটা অজ অনাদি সজ্ঞান সর্ব্বভূতস্থ চিৎপুরুষ—যিনি সত্য শিব ও সুন্দর—এমন যদি থাকেন জীবভাগ্য যদি দেবভাগ্যে, সর্ব্বশেষে ঈশ্বরভাগ্যে পরিণত হয়? তখন?

কাজেই এ জ্ঞানের মঙ্গলজনক ফল বহুদূরব্যাপী। একটা নূতন উপগ্রহ বা একটা নূতন ধাতু বা একটা নব শ্রেণীর লতা বা পাখী বা যন্ত্রের আবিষ্কারের যে উপকারিতা, বিদেহ আত্মার অস্তিত্ব আবিষ্কারে তার চেয়ে কোটী গুণের উপকারিতা, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? জড় বিজ্ঞানলব্ধ প্রাকৃতিক বিধিনিয়মগুলার জ্ঞান যেমন আমাদের বিশ্বাসের মজ্জাগত লইয়া আমাদিগকে

জড় জগতে চালাইতেছে তেমনি করিয়া এই চিৎবিজ্ঞান লব্ধ আত্মার অমরত্বের বিশ্বাস আমাদের মজ্জাগত হইয়া নৈতিক জীবনে যদি প্রত্যেক চিত্তে এই ধ্রুবধারণা জাগাইয়া দেয় যে—

No sudden heaven, nor sudden hell, for man.
But thro' the will of One who knows and rules
And utter knowledge is but utter love.
Æonian Evolution, swwift and slow
Thro' all the spheres an ever opening height
An ever lessening Earth.

যে সহসা নগরগতি বা স্বর্গপ্রাপ্তি বলিয়া কিছুই নাই, এক জগদ্রূপের আগে এসব বিবৃত্ত, সে জ্ঞানপূর্ণ প্রেম, এ জগতই পাইয়া হ্রাস হইতে হইতে চলিয়াছে। তাহা হইলে এর চেয়ে পরম প্রেয় ও চরম শ্রেয় মানব ভাগ্যে আর কি হইতে পারে?

আহ্বান

(জ্যোতির্ম্ময়ী)

উঠ বীর স্বপ্ন হ'তে
কর্ম্ম তব শিয়রে দাঁড়ায়ে
করিছে আহ্বান।
দুঃখেরে বরণ করি
রত হও কাজে—আপনারে
দিয়া বলিদান।
ত্যাগ-বর্ম্মে সর্ব্ব অঙ্গ
করি আচ্ছাদিত—তূণ-পূর্ণ
কর প্রেম-শরে।
সত্যের মুকুট পরি'
কর্ম্মক্ষেত্রে চল—বিশ্বজয়ী
জ্ঞান অস্ত্র করে।

পল্লী সত্য, কি জনপদ সত্য।

(শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ।)

বাঙ্গলায় অধিকাংশ পল্লী মৃত্যুমুখে; পাশ্চাত্যের ভোগমুখী স্পর্শে নাগরিক জীবন গড়িয়া উঠায় অযত্নে পল্লীগুলি মরিতে বসিয়াছে। এ যেন জাতির জীবনপ্রবাহ কৃত্রিম খাল কাটিয়া নগরের আদর্শ কৃষিক্ষেত্র উর্ব্বর করিতে টানিয়া লওয়ায় পল্লী-নদীর বুকে চরা পড়িতেছে। তাই আজ দেশ ভরিয়া ডাক উঠিয়াছে, "ঘরে ফিরিয়া চল; ভরপুর শান্তির শ্যাম শোভায় জীবনের জল নূতন উজানে ফিরাইয়া লও!"

কিন্তু কথা হইতেছে এই, যে, কোন্‌টি সত্য? নগর সত্য কি পল্লী সত্য? কোথায় কোন্ জীবনে আমরা অন্তরের চরিতার্থতা চূড়ান্ত সুখে পাই? এত দিন "নগর" "নগর" করিয়া পাগল হইয়া ছুটিলে, আবার আজ "পল্লী" "পল্লী" বলিয়া নগরের বুকে শ্মশান রচিয়া কোথায় যাইবে? নগর ও পল্লী দুই লইয়াই ত দেশ। আগেও ত তাম্রলিপ্তি পাটলীপুত্র অযোধ্যা কাশী ইন্দ্রপ্রস্থ নামে কত বড় বড় নগর জনপদ ছিল। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এক সীমা হইতে সীমান্তরে দুলিয়া দুলিয়াই কি আমরা চির দিন জীবনের সত্য খুঁজিব? দুই অত্যন্তের, —চূড়াণ্ডের মাঝের স্বর্ণসূত্র—লয়-মধুর সামঞ্জস্য ধরিয়া কি কখন জীবনকে পূর্ণ সত্য করিয়া পাইব না?

মানুষের জীবনে গ্রামই যদি এক মাত্র সত্য হয় তাহা হইলে মানুষ আসিয়া নগরে সমবেত হয় কেন, কোন্ বৃহতের টানে কোন্ ভূমার আস্বাদনে লুব্ধ হইয়া জনপদ রচনা করিয়া বসে? যে সত্যের প্রেরণায় মানুষ আপনাকে লইয়া তুষ্ট নয় কিন্তু স্ত্রীপুত্র আত্ম পরিজনে নিজেকে বিলাইয়া আস্বাদন করিয়া আরও গভীর করিয়া পায়, যে অন্তরের সহজ ব্যাপ্তির টানে এহেন আত্মপরিজনের সুখের গণ্ডী ভাঙিয়া স্বগ্রাম ও আরও দশটি গ্রামান্তরকে লইয়া পল্লীমণ্ডলী রচনা করিয়া বসে, সেই বৃহতের ক্ষুধাই তাহাকে নগর জাতি দেশ এবং অবশেষে বিশ্বমানবেও পরিতৃপ্ত রাখিতে পারে না। মানুষ বাহ্যতঃ দেখিতে অতটুকু হইলেও অন্তরেযে অকূল—"the ocean had somehow been poured into the drop"—এই বিন্দুর মাঝে যে অনন্তের সিন্ধু বাস করে।

গ্রাম্য পাঞ্চায়েত বা village commune ভারতের অধিকাংশ জীবন

ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া ভারতে জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্ গজায় নাই। গ্রাম্য পঞ্চায়েত গুলি আমাদের জীবন ও তাহার সৃষ্টিকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। গ্রামবাসীরা গ্রামেই আদান প্রদানের বিনিময়ে যে সুখনীড়টি রচনা করিয়া বসিয়া থাকিত, তাহা এমনি শান্তি ও আরাম প্রদ, সকল অভাব অভিযোগের এমনি সহজ শরণ ও আশ্রয়,যে গ্রামবাসীদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাধ চেষ্টা ক্রমশঃই গুটাইয়া অন্তর্মুখী হইয়া পড়িত, জীবনের স্পর্শ দেশকে—বৃহৎ সমাজকে জড়াইয়া ধরিবার কোন প্রেরণাই পাইত না। সহজ শান্ত ক্ষুদ্র পল্লী-জীবনে পরিসর আদৌ ছিল না; সামন্য যেটুকু ব্যাপ্তি ছিল তাহা মাত্র পরমার্থ জীবনে, ভারত-ব্যাপী তীর্থের মধ্যে দিয়াই ছিল। রাজনীতিক জীবনে, পণ্যে শিল্পে গ্রামের দান ছিল অতি তুচ্ছ; পাটলীপুত্র তাম্রলিপ্তি ইন্দ্রপ্রস্থের মত নগরই তাহা সামান্য ভাবে জাগাইয়া রাখিত। তাই রাষ্ট্রপীঠ রচনা হইত সমস্ত অখণ্ড ভারত জুড়িয়া নয়, দেশে দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন রাজপাটে। সমস্ত ভারতের অখণ্ড আত্মজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গ পঞ্চনদ দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশেও দেখি রাজশক্তি ও রাষ্ট্রজীবনের সহিত প্রজার নাড়ীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। হয় তো বৈরাজ্য নামক জনতন্ত্রের সময়ে গ্রীক অভিজানের পূর্ব্বে ও পরে কিছু দিন তাহা ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ তাহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া রাজার উপর অন্ধ ভক্তি ওকরদানে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সে ভক্তি-অর্ঘ্য ও করভারও গ্রাম্য মণ্ডলীর কর্ম্মচারী বহিয়া দিত জনপদে, জনপদ পাঠাইত রাজাকে।

মানুষের নিয়মই এই; তাহার অভাবের প্রেরণায়, আত্মার ক্ষুধায়, মন বুদ্ধি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির বাসনায় সে ফোটে। এই সব ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষা কামনা গুলি জড়াইয়া তাহাদিগকে সার্থক করিয়া যে সৃষ্টি তাহারই সহিত মানুষের জীবনের নাড়ীর যোগ কখনও ঘুচে না। যদি মানুষের সহজ ক্ষুধাগুলি সহজে ঘরের আঙ্গিনায় গ্রামের গোলাঘরে মিটাইয়া দাও, তাহা হইলে সে আর বৃহৎ হইয়া ফুটিবে না, দূরান্তরের মানুষকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে স্পর্শ দিয়া বাঁচাইয়া নিজে বাঁচিয়া উঠিতে চাহিবে না। যেখানে রাষ্ট্র বা জাতীয়তার রূপ বিগ্রহ বা কর্ম্ম যত ছোট, সেখানে তাহার বোধ মানুষের মনে তত অস্পষ্ট; যেখানে রাজ্যের জন্য,—সমাজ সাহিত্য জ্ঞান বিজ্ঞান পণ্য শিল্পের জন্য বড় ও ছোট—নগর ও গ্রাম পরস্পরের কাছে ঐকান্তিক ও অপরিহার্য্য নয়, সেখানে কল্পিত সম্বন্ধ নাড়ীর যোগকে প্রাণবান্ করিবে কেন?

নগরে ও রাজধানীতে গিয়া যোদ্ধা সামন্ত ও নাগরিকের মাঝে রাজশক্তি

শিল্প সম্ভার কেন্দ্রগত হওয়ায়, এবং গ্রামগুলি পঞ্চায়েত বা মণ্ডলীর অধীনে সামান্য জীবনযাত্রার উপকরণ শস্য ও বিধি ব্যবস্থা গ্রাম্য জীবনের গণ্ডীর মাঝেই পাওয়ায় এ দেশে জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজম্ বিগ্রহ ধরে নাই। তাহার উপর ভারত পরমার্থমুখী অন্তর্মুখ জাত আর তাহার উপর উপর্য্যুপরি বৌদ্ধ ও শাঙ্কর যুগের মায়া-বাদের শিক্ষা। খাইয়া পরিয়া কৃষি গোধন রক্ষা করিয়া যে জীবন ও উৎসাহ উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহা লইয়া তীর্থ দর্শন, মন্দিরে পূজা ও ভবপারের পাথেয় সঞ্চয়ই চলিত। যাহাদিগের প্রাণ বড়, জ্ঞান অধিক, ক্ষেত্র কতকটা স্বভাবতঃ সংস্কারমুক্ত, তাহারা নাগরিক জীবনে আসিয়া তাহা পরিতৃপ্ত-করিত।

সত্য সত্যই গ্রাম ও নগর জীবনের দুই দিক দিয়া বিভিন্ন ভাবে একই প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা মাত্র। , ব্যষ্টির দিকে জীবনকে সর্ব্বার্থসাধক সুসমঞ্জস ও শান্তিপ্রদ করিতে গিয়া গ্রাম্যমণ্ডলী বা কমিউনের সৃষ্টি। কিন্তু তাহাতে বৃহতের বা ভূমার ক্ষুধা মিটে না বলিয়া জনপদও সুরপুরীকে পরাস্ত করিয়া আপন সৌন্দর্য্যে কলায় স্থাপত্যে ও জীবনের পণ্য ও সুখসম্ভারে গঠিত হইয়া উঠিতে ছিল।

যদি গ্রাম ও জনপদ এই দুয়ের ভাল—দুয়ের সুবিধা একাধারে পাই তবে মানুষ বোধ হয় উর্দ্ধগ অথচ অধগ, বৃহৎ অথচ তরল, ক্ষুদ্রে পূর্ণ অথচ বৃহতে অপরিসীম হইয়া ফুটিতে পায়। গ্রামের শান্তি আছে, স্নিগ্ধতা আছে, মুক্ত বায়ু ও আলোকে সহজ জীবন আছে, আর প্রাণে প্রাণে প্রতিবেশী জীবনের নিবিড় সুখদুঃখের তন্ময় বন্ধন আছে। জনপদে দেশ-আত্মার স্পর্শ আছে, বহুর মিলন ও প্রসার আছে, শিল্পকলা সাহিত্য জ্ঞান ও বিপুল কর্ম্ম যন্ত্রের টান আছে। দুইকে মিশাও, পাইবে উদ্যান-জনপদ বা garden-cities; আজ কাল পাশ্চাত্যে এই আদর্শে জনপদ-গুলিকে ভাঙিয়া প্রকৃতির বিজনে শ্যামাঞ্চলের মাঝে গড়িতে চেষ্টা চলিতেছে।

আমাদিগকেও গ্রামের সুখ জনপদে আনিয়া বাঁটিয়া দিয়া জনপদের জ্ঞান গরিমা বিপুলতা সমৃদ্ধি গ্রামে লইয়া যাইতে হইবে। গ্রামকে নগর ও নগরকে গ্রামে পরিণত করিতে হইবে। সমস্ত দেশকে একটি জীবন্ত নাড়ীর যোগে বিপুল মূর্চ্ছনায় বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। গ্রামকে ক্ষুদ্র রাখিলে তাহাকে শিল্পে কলায় বিদ্যায় সম্পদে বড় করিতে পারিবে না, কারণ ক্ষুদ্রের সে ধনবল জনবল ও প্রেরণা কোথায়? এই পল্লী জীবনের পুনর্গঠনের দিনে আমাদের জাতীয়

ধর্ম্মের নব-সাধকদিগকে এ কথা ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পল্লী ও নগর একই সত্যের দুইটী আংশিক অভিব্যক্তি, তোমারই আমারই কামনায় উদ্গম ও অধগ দ্বিধা অভিব্যক্তি ; সে গ্রামে পূর্ণকে অংশে দেখাইতে চাহিয়াছে—আর নগরে তাহারই বিপুলতর ছন্দ পাইয়াছে। দুইকে মিলাও, হরিহররূপ পাইবে ; ভারতের জীবন নূতনে অভিনব হইয়া ফুটিবে। পুরাতন ও নূতন একের মাঝে সার্থক সামঞ্জস্য লভিবে।

বঁধু-দরশনে।

(শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী)

মরমের মম এক বন্ধন
নয়নের মম চির নন্দন
বঁধু যে
উন্মুখ মম চাতক শ্রবণ
অবিরল ধারে করি সিঞ্চন
বেণু-জলধর বিগলিত-স্বর
মধুতে
পিপাসিত মম চকোর-নয়ন
করি অবিরত হরষ-মগন
চন্দ্র-বদন-রক্ষিত-কিরণ
পুঞ্জে
হ'তেছে উদয় আমার হৃদয়
কুঞ্জে

* *

মন্দ মন্দ চরণ পাত
মরমে মৃদুল মধুরঘাত।
দরশে দরশে নূতন রস
হেলনে দোলনে ভুবন বশ।

দিব্য মধুর রঙ্গ ভরে
দিশি দিশি দিশি তরল করে।
পরশের রসে হরষে অতি
মণি-মঞ্জীর বাজিছে তথি।
উঠিছে পড়িছে লাস্য মাঝে
তালে তালে তালে মুরলী বাজে।
অশরণ মম শরণ সার
যুগল চরণ-কমল তার
নাচিয়া নাচিয়া পরাণ লুটে
নয়নে গোপন মরমে ফুটে।

* *

ইচ্ছা করে গগন-থালে
সাজায়ে তারা কুসুম-মালে
শশীর দীপ জ্বালি
বঁধু হে! তব বদন-দেশে
সংজ্ঞা-হারা পাগল বেশে
আরতি করি খালি!
আরতি শেষে ধন্য মানি
ছুঁড়িয়া ফেলি সে দীপখানি
ধ্যানের দরিয়ায়,
স্মরিয়া তব করুণা নাথ!
এ মোর দেহ করি গো পাত
তোমার পদ-ছায়।

* *

দরশন দানে বহালে পরাণে
প্রেমের নদী ;
বহে প্রেম-লোর, ভাগ্যের মোর
নাহি অবধি!
কি বর মাগিব তুহার চরণে
বঁধু হে!

পড়ুক উছলি বচনে আমার
নিপীড়ি মধুর চক্র তোমার
মধু হে !
হে চিরকিশোর ! কৈশোর তব
লয়ে চপলতা পূর্ণ বিভব
চিত্তে মোর
একমুখী তব চিন্তার ধার
তুলি অবিরত পরাণ আমার
করুক ভোর !

* *

ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম
না করি ভিক্ষা তোমার ঠাঁই,
অস্থি-চর্ম্ম-মর্ম্মারাম
চিত্তে যদি সে ভক্তি পাই।
দিব্য কিশোর মূর্ত্তিখানি
দৈবে নেত্রে ফলিল মোর,
তাইতে মরমে তৃপ্তি মানি,
তাইতে চিত্ত হইল ভোর।
মানস পদ্ম মধ্যে যবে
সঞ্চিত হয় ভক্তি মধু,
অঞ্জলি ধরি মুক্তি তবে
ভৃঙ্গের মত গুঞ্জে বধু !
উন্মুখ যবে রন্ধ্র-মুখ,
অন্তরে পশি ভুঞ্জে সুখ।

* *

মাধুরী-সিন্ধু হে মোর বন্ধু !
তোমারে নমস্কার !
তোমার মহিমা না জানে বচন,
তোমার স্বরূপ নাহি জানে মন.

তোমার মাধুরী প্রাণ করে চুরি,
জগতে চমৎকার !
একি রূপ তব ওগো সুন্দর !
রস-পিপাসিত জনের নাগর !
রসিকের হিয়া সে রূপে মজিয়া
গভীর হরষে উঠে পুলকিয়া
চমকি বারম্বার !
লুণ্ঠিত শিরে হে মোর দয়িত !
তোমারে নমস্কার !

* * *

ঈষত অরুণ নয়ন সুধা
পান করি মোর বাড়িল ক্ষুধা।
অধীর অধীর মানস মোর
মধুকর সম মধু-বিভোর
মুখ-পঙ্কজে আবেশে বসি
মধুর অধর-রন্ধ্রে পশি
মুহু মুহু চায় হারায়ে জ্ঞান
চুম্বন মধু করিতে পান।

* * *

মধুর মধুর কান্তি বঁধুর !
মধুর মধুর বদন মধুর !
গন্ধ মধুর ! হাসিটি মধুর !
মধুর বঁধুর সকলি মধুর।

* * *

একি এ কান্তি মুখ-ইন্দুর !
একি বেশ তব মধুর মধুর !
হে মোর বন্ধু ! পরাণ হে !
একি মাধুর্য্য হিয়ার মাঝারে !
বাক্য আমার ধরিতে না পারে !
আঁখি অপলক, অঙ্গে পুলক;
নীরব মুখর বয়ান হে।

বুদ্ধি হইল জড়ের মতন,
মুগ্ধ চিত্ত, বিমোহিত মম,
না পারি করিতে স্বাদন হে!
এ লীলা মাধুরী তোমার! তোমার!
নিজে তুমি লহ আস্বাদ তার
আত্ম-মগন রমণ হে!
অঞ্জলি এই বাঁধিনু মাথায়,
লুণ্ঠিনু শির ওই রাঙা পায়
বার বার মম জীবন হে!

* * *

নাথ হে!
নিবেদন করি তুয়া পায়ঃ
এ মোর নয়ন দুটি যেখানে পড়িছে লুটি
সেখানে রহগো ফুটি মাধুরী লীলায়;
সেখানে করুণা-ভরা বিশাল লোচন-তারা
মধুর কিরণ ধারা করুক বর্ষণ,
সেখানে বিনোদ বাঁশী ঢালুক অমিয় রাশি,
ভুজঙ্গ দোলায়ে ফণা করুক নর্ত্তন!

চিঠির গুচ্ছ।

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।]

(১)

ভাই নরেশ,—

একই ডাকে দু'খানা চিঠি পেলুম—তোমার আর পিতৃদেবের। বাবা যা লিখেছেন, সেই কথাগুলিই অন্যভাবে সাজিয়ে তুমি পাঠিয়েচ। বোঝা গেল তাঁরই উপদেশ মত তুমি এরূপ করেচ।

সন্ন্যাসী হবার মতলব আমার কোনদিনই ছিল না, সেটা তুমি জান।

কাজেই পিতৃদেব তাঁর বংশ দুলালকে কোন ডানাকাটা পরীর রূপের ফাঁস পরিয়ে সংসারে টেনে রাখবার জন্য—যদি বা ব্যগ্র হয়ে থাকেন—তোমার কিন্তু তেমন কোন আশঙ্কা ছিল না। তুমি যদি তাঁকে আমার কথাগুলো বুঝিয়ে বলতে, তা'হলে আমায় আজ এই সঙ্কটে পড়তে হোত না।

তুমি লিখেচ, যারা বিবাহ না করার ধূয়া তোলে, তাদের অন্তরে গোপন রয়েচে জীবনের দায়িত্বকে ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি। অন্য কারু মনের খবর আমি রাখিনে—তবে আমার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তুমি অসঙ্কোচে আনতে পার এবং সেটা যে মিথ্যা নয়, তাও স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত হব না।

সত্যিই আমি দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে তুলে নিতে নারাজ। এর উত্তরে তুমি যা বলবে, তা আমি অনুমানে ঠিক করে নিয়েচি। তুমি বলবে, আমাকে দিয়ে তা'হলে দুনিয়ার কোনই কাজ হবে না। না হবারই সম্ভাবনা বেশি। কারণ, দুনিয়াটা যত বড়, তার কাজও তেমনি বিরাট। সেই কাজে লেগে যাবার মত স্পর্দ্ধা আমার নেই। তাতে বুকে যতটা বল থাকা দরকার, তার শতাংশের এক অংশও আমি কখনো অনুভব করিনি। আমার বিশ্বাস, ইচ্ছে করলেই ও-কাজটা করা চলে না। ওর জন্য ভিন্ন শক্তি থাকা চাই। আমি জানি, এই নিয়ে তুমি দস্তুর মত তর্ক করতে প্রস্তুত। তুমি প্রতিপন্ন করবেই যে, মানুষের মাঝে যে শক্তি লুকিয়ে ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তুল্লেই মানুষ সব কিছু করতে পারে। কারণ, তুমি বিশ্বাস কর, আমরা হচ্চি সব "অমৃতস্য পুত্রাঃ।" নেহাৎ যদি আমার মাঝে গোপন রয়েচে যে শক্তি, তাকে কথার জোরে জাগ্রত করতে তুমি অক্ষম হও, তা হলেও হিতোপদেশের তৃণগুচ্ছের সংহতি শক্তি আর ত্রেতা যুগে সমুদ্রবন্ধন ব্যাপারে কাঠ-বিড়ালীদের সাহায্যের নজীর খাড়া করতে তুমি বিরক্ত হবে না। মনে মনে ও-সব আলোচনা করেও আমি স্পষ্টই বুঝতে পেরেচি, তোমরা যাকে 'মহৎ-কাজ' বল আমাকে দিয়ে তার একটুকুও কিছু হবে না।

আমি লোকটি যে অলস তা তোমার অবিদিত নেই। ইজি চেয়ারে চিৎ হয়ে পড়ে যখন চুরুটের ধোঁয়া বাতাসে ছড়িয়ে যেতে দেখি, তখন যেমন দিব্যি আরাম অনুভব করি, তেমনি রাত-দুপুরে, অ-কেজো—বাজে বলে যে পুঁথিগুলি তোমরা হাত দিয়ে ছুঁতেও নারাজ সেগুলি পড়তে পড়তে যখন দুনিয়ার অনেক কথাই ভুলে যাই, তখন এমন একটা আনন্দ অনুভব করি, যা ভাষা দিয়ে বোঝান না গেলেও দস্তুর মত আরাম জনক।

তুমি প্রশ্ন করবে, জীবনটা কি আমার চিরদিনই এমনি করে কেটে যাবে? এই ধরণের প্রশ্নকে আমি সত্যিই বড় ভয় করি। কারণ, ও-সব বিচারে খানিকটা এগিয়ে গেলে শেষটায় এমন যায়গায় গিয়ে পৌছিতে হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। বড়ই বিশ্রী সে।

আমি চাই পাবার মত করে জীবনকে পেতে—একেবারে প্রাণময় হয়ে যেতে। কোনরূপ বন্ধনে কখনো আমার জীবনকে আড়ষ্ট করে ফেলতে আমি দেব না। আমার হৃদয়াকাশে আনন্দ-সবিতা চিরদিনই আলোয় আলোয় উষ্ণ করে রাখবে, পুলকিত করে তুলবে। চারিদিকে আঁধার করে কখনো যদি রাশি রাশি মেঘ জমে ওঠে, তা হলেও তার বুক-ভরা নিরানন্দের মাঝে পড়ে আমি 'হা হতোস্মি' বলে করুণ আর্ত্তনাদ দিগন্তে না ছড়িয়ে মেঘ কেটে যাবার অপেক্ষা করেই বসে থাকব। তখন আমার অন্তরের অন্তর হতে যে সুর ফুটে বার হবে, তার মাঝেও থাকবে বিশেষ একটা মাধুর্য্য, নূতন ধরণের রাগিণী।

আগে একবার তোমায় লিখেছিলুম যে, তোমাতে আর আমাতে একটা বিরাট ব্যবধান রয়েচে। উত্তরে তুমি জানিয়েচ যে, সে-টা ঠিক নয়; কারণ, তা'হলে আমরা এমন অটুট বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতুম না। বন্ধু তুমি আমার একমাত্র দুনিয়ায়—একথা ভাবতেও আমি আরাম পাই, আরও আরাম পাই এই কথাই ভেবে যে, এই বন্ধুত্ব কখনো আমাদের নিজ নিজ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য দাবী করে বসেনি। তা যদি করত, তুমি যদি আমাকে তোমারই ফটোগ্রাফ করে তুলতে চাইতে, অথবা আমি যদি চাইতুম তোমাকে একেবারে আমার ছাঁচেই ঢেলে নিতে, তা হলে আমাদের অন্তরের প্রীতি অ- প্রীতিতেই পরিণত হোত— সুধা শেষটায় গরল হয়েই উঠত।

যাক্ সে কথা। এখন তোমার প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করি। আমার প্রথম কথা হচ্চে এই যে, বিয়ে করাটা যে এখন খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েচে, তা আমি মোটেও বুঝতে পারচিনে। অভিভাবকদের পক্ষ হতে এত তাড়া হুড়োর মানে হচ্চে এই যে, এ বয়সেও আমার বিয়ে না দেওয়াটা তাঁরা ভালো দেখায় না বলে মনে করেন। বউদি অবশ্য একটি ছোট-খাট টুকটুকে বউ পাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়েচেন—আর সে আজ নতুন নয়। সাত বছর আগে যখন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে ছিলুম তখন হতেই।

সৌভাগ্যক্রমে পিতৃদেব তখন সে কথা কাণেই তুলতেন না; স্পষ্ট বলে দিয়ে ছিলেন যে পড়া শেষ না হলে বিয়ে দেওয়া হবে না। বউদি অগত্যা বছর গুণে গুণে আশায় দিন কাটিয়ে ছিলেন। তারপর কলেজের ছাত্রত্ব ঘুচিয়ে যখন তার অধ্যাপক শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হলুম, তখন হতেই বউদি একেবারে ধৈর্য্য হারা হয়ে উঠলেন। বার বছর বয়সে মা'কে হারিয়েচি আর তারপর এই তের বছর সমস্ত দাবী দাওয়া, শতরকম মান-অভিমান অবাধে তাঁর উপর আমি চালিয়ে এসেচি। পেয়েচিও তাঁর বুকভরা স্নেহের সমস্তটাই অংশ। কাজেই তাঁর দাবী আজ অগ্রাহ্য করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বউ সম্বন্ধে তাঁর যে আদর্শ, তা আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারিনে।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, আমার যে স্ত্রী হবে, তার কাছে আমি কি প্রত্যাশা করব? নিজে বিয়ে করেও একথা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার, ভেবে আমি বিস্মিত হচ্ছি। তাদের কাছে প্রত্যাশা কি কিছু করা যায়? অযাচিত ভাবে যা তারা দিয়ে আসচে, তার বেশী কিছু দেবার শক্তি কি তাদের মাঝে আমরা রেখেচি? তাদের কি কিছু আমরা শিখতে বা বুঝতে দিয়ে থাকি, যার ফলে তারা আমাদের দাসী না হয়ে সহধর্ম্মিণী হতে পারে?

আমরা কথায় কথায় মনুর দোহাই মেনে উঁচু গলায় ঘোষণা করি যে, আমাদের দেশে আবহমান কাল হতে নারীকে দেবীর আসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। "নার্য্যস্তু যত্র পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ" কথা নজীর স্বরূপ যখন তখনই আমরা বলে থাকি।

নারীকে আমরা পূজা না হয় নাই বা করলুম, কিন্তু মানুষের অধিকার যা, তা' হতে তাদের বঞ্চিত রাখবার পরোয়ানা আমাদের হাতে তুলে কে দিয়েচে? 'শক্তি মনের ধর্ম্ম' ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মের এরূপ বিধান হতেই পারে না, আর সে বিধান যদি আমরা মেনে চলি তা হলে আমাদের অনেক দূরে পিছিয়ে যেতে হবে হয় ত একেবারে সেই আদিম যুগে। সেখানে ফিরে যেতে আমি চাই। কাজেই আমার মতে, সামনের পথে যত কিছু আগাছা, সব দূর করে ফেলা দরকার; নইলে চলবার ব্যাঘাত ঘটবে।

তুমি আরও লিখেচ যে, ইচ্ছে করলে যে কোন বাঙালী বধূকে স্বামী নিজের মনের মতটি করে গড়ে তুলতে পারে। তা হয়ত সম্ভব; কারণ, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য তাদের যে মোটেই নেই। তুমি ওতেই তৃপ্ত—আমি কিন্তু মোটেই নই। যুগ-যুগান্ত তাচ্ছিল্যের ফলে মেয়েরা আপনাদের কথা একেবারেই

ভুলে গিয়েচে। তাই আমরা তাদের পোষ মানাটাকেই স্বাভাবিক বলে মনে করচি। কিন্তু বাস্তব পক্ষে এর চাইতে অনিষ্টকর আর কোন ব্যাধি মানুষের এত ক্ষতিকরতে পারে না।

তোমার আর একটা ধারণা এই যে, আমি একটা বিবি গোছের মেয়েকেই বিয়ে করব। ভয় নেই, বিয়ে করলে আমি কোন বঙ্গ-বালাকেই করব; তবে সে গাউণ পরবে কি বাইক চড়বে, অথবা তার শাড়ীর বহর আরো বাড়িয়ে নেবে, তা' স্থির হবে, তার শারীরিক সৌন্দর্য্য, শক্তি আর মানসিক প্রবৃত্তি বিবেচনা করে। তার বেশভূষা, তার চাল-চলন, শোভন হবে, সুন্দর হবে, আর তারই মনের মতটি হবে। সে সাহিত্যালোচনা করবে, না সেবাব্রত গ্রহণ করবে—কি কিছুই করবে না; কেবল হাসবে; গল্প করবে আর ঘুমুবে ——তা নিশ্চিতই আমি স্থির করে দেব না।

আমি শুধু দেখব সে যেন নিজেকে দাসী মনে করে সর্ব্বদাই খাট হয়ে না থাকে, আর আমিও যেন স্বামিত্বের দাবী করে তার ভিতরের নারীত্বকে গলা টিপে মেরে একটা জীবনকে একেবারে ব্যর্থ না করে ফেলি।

তোমার চিঠির জবাব স্বরূপ আমার যা বলবার ছিল, তা লিখে পাঠালুম। এই লম্বা চিঠি তোমার মূল্যবান সময় নিশ্চিতই খানিকটা নষ্ট করল একেবারে বাজে রকমে। এই সময়টা ব্রিফ্ ওল্টালে তোমার মক্কেলও তুষ্ট হোত, কোন কিছুর মিষ্টি আওয়াজও শুনতে পেতে।

ভাল কথা, কনক যে একেবারে চিঠি লেখা ছেড়ে দিয়েচে। ইতি

তোমারই মোহিত।

(২)

স্নেহের ঠাকুর পো!

তোমার বন্ধু নরেশের নিকট তুমি যে চিঠিখানা লিখেচ, কনকের মারফত তা আমার হাতে এসে পৌঁছেচে। কনক হচ্চে আমার দূর সম্পর্কের মামাত বোন। তারই স্বামীই যে তোমার বন্ধু নরেশ, আর কনক যে তোমার কাছে রীতিমত নিয়মিত চিঠি লেখে, তা তুমি আমায় কোন দিন বলনি। কনক আমায় লিখেচে যে, তুমি নাকি তাকে ছোট্ট বোনটির মতই স্নেহ কর আর সেও নাকি তোমার মত লোককে ভাই বলতে পেয়ে খুসী হয়েচে। তার চিঠিতে তোমার সুখ্যাতি আর ধরে না।

তোমার চিঠিতে দেখলুম যে, তুমি আমার দাবীটা উড়িয়ে দিতে পারচ না বিয়ে করতে কতকটা নিমরাজী গোছের হয়ে পড়েচ। কেবল আমার পছন্দ মত মেয়েকে তুমি সহধর্ম্মিণীর আসনে বসাতে নারাজ; অথচ, কেমনটি হলে তোমার পছন্দ হয়, তা না ব'লে, যা তা কিছু লিখে চিঠির কাগজ ভরেচ।

আমার অল্প বুদ্ধি নিয়ে তার কোন অর্থই বার করতে পারলুম না। তাই চিঠিখানা একেবারে তোমার দাদার কাছেই পেশ করলুম। পড়ে তিনি গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"কেশ লিখেচে।" আমি হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম—আর তোমার নির্ব্বিকার অগ্রজ মশাই বেশ নিশ্চিন্ত মনে চুরুট টানতে লাগলেন। রাগে আমার সমস্তটা শরীর কাঁপ্‌তে লাগল।

আমি মনে মনে স্থির করলুম, যে, তোমার বিয়ের কথা আর কাউকে কোন দিন কিছু বলব না। বিবাগী হয়ে যেখানে ইচ্ছে তুমি চলে যাও। আমার কি? তুমি ত আর আমার ভাই নও? যার ভাই, সেই যদি আগ্রহ না দেখালে, তা হলে আমারই বা এত মাথা ব্যাথা কেন?

শেষের কথাগুলো তোমার দাদাকে শুনিয়ে দিয়ে আমি অন্য ঘরে চলে গেলুম। খাবার সময় বাবা যখন তোমার বিয়ের কথা উত্থাপন করলেন, তখন কাজের ছলে আমি সরে পড়লুম। সত্যই আমি শপথ করেছিলুম, এ সম্বন্ধে আমি একেবারে নীরব থাকব। কিন্তু, তারপর একা একা বসে থেকে আমার মনে হোল চোরের ওপর রাগ করে যে মাটীতে ভাত খায়, সে মস্ত বড় বোকা। আমি যদি তোমার দিকে না চাই, তা হলে কে আর চাইবে? কে আর আছে তোমার? যাঁর ভাবনার অবধি থাকত না তিনি স্বর্গের দেবী স্বর্গেই চলে গেছেন—যাঁরা রয়েচেন, তাঁরা ত সব পাথর দিয়ে গড়া। তোমার সুখ দুঃখে তাদের প্রাণ নাচেও না কাঁদেও না।

বিদেশে কত কষ্টই পাচ্ছ! ঠাকুর চাকরের ওপর নির্ভর। মাইনে করা লোক দিয়ে কি সব কাজ চলে? তোমার দাদাটি কিন্তু মোটেই ভাল লোক নন। দুনিয়ার স্বার্থপর, আর বুদ্ধিতেও যে একটু খাট, এত দিনে তাও আমি আবিষ্কার করে ফেলেচি। আমি বেচারা যখনই তাঁকে তোমার অসুবিধার কথা বলি, তখনই তিনি উত্তর দেন—কিছু টাকা পাঠিয়ে দাও! শুনে আমার গা যেন জলে ওঠে। টাকা দিয়েই নাকি সব অসুবিধা দূর করা যায়!

বিদেশে বন্ধু-বান্ধব হীন যায়গায় থাকার যে কষ্ট তা তোমার দাদা কি করে বুঝবেন—চিরকাল ত বাড়ী থেকে আরামেই কাটিয়ে দিলেন। রোস, আমি তাঁকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। আগে তোমার বিয়েটা হয়ে যাক—তারপর আমরা দু' বোন ছেলেমেয়েদের আর বাবাকে নিয়ে তোমার ওখানে গিয়ে থাকব। তখন তোমার দাদা বুঝতে পারবেন একা থাকার অসুবিধা কত।

বউ সম্বন্ধে আমার যা আদর্শ তা নাকি তুমি মোটেই বরদাস্ত করতে পার না। আমার মনে হয় কতকটা পার আর কতকটা পার না। লাল-টুকটুকে হলে নিশ্চিতই খুসী হও—ছোট-খাটটিই পছন্দ কর না, কেমন?

তোমার মনের মতটিই আমি খুঁজচি—সন্ধানও একটির পেয়েচি। কর্শিয়াং থেকে ইস্কুলে পড়ে—শুনচি খুব বিদ্যা। মেয়ের বাপ সেখানেই চাকরী করেন। বড়দিনের ছুটিতে সব কলকাতায় আসচেন—তুমিও এসো। দুজনে মিলে মেয়ে দেখা যাবে।

তোমার বিয়েটা হয়ে গেলে আমি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তোমাদের সংসারের ষোল আনা কাজ, তারপর আবার তুমি রয়েচ অত দূর দেশে; তার জন্য সকল সময়েই একটু চিন্তা। তোমার একটি বউ হলে, তার উপর সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে আমি একটু নিশ্চিন্ত থাকতে পারি।

ছেলে মেয়েরা তাদের কাকীমাকে দেখাবার জন্য যত রাজ্যের যা কিছু পাচ্ছে সব জমিয়ে রাখচে। তোমার থাকবার ঘরটা ঘসে মেজে একেবারে নতুন করে ফেলেচে। বাবা রোজ সন্ধ্যায় তাদের নিয়ে বসে কাকীমা এলে কে কি করবে, কে বেশী ভালবাসবে অথবা ভালবাসা পাবে, তারই আলোচনায় মগ্ন থাকেন। তাঁর রামায়ণ মহাভারতের উপর দু-আঙ্গুল পুরু হয়ে ধূলো জমে উঠেচে। আমরা সকলেই যেন সমস্ত নিয়ম কানুন ভুলে গিয়েচি—কেবল তোমার দাদা সেই দশটায় আপিসে বেরিয়ে যাচ্ছেন আর সন্ধ্যা সাতটায় পেঁচার মত মুখটি করে ঘরে ফিরচেন। বেচারা যে করে খাটে!

আজ পার্শেল করে তোমার জন্য কিছু খাবার পাঠালুম—খেতে কেমন হয়েচে জানিয়ো। তোমার খবর রোজই লিখো। ইতি।

আশীর্ব্বাদীকা
তোমার—বড় দি!

স্নেহের মোহিত!

তুমি যে চিঠি খানা লিখেছিলে সেখানা কনক তোমার বউ-দির কাছে পাঠিয়ে দিয়েচে—এ খবরটা এতদিন তুমি নিশ্চিতই পেয়েচ। এই দুষ্কৃতির জন্য কনকই সম্পূর্ণ দায়ী—আমি কিন্তু জান্তম না যে চিঠি খানা চুরি গিয়েচে। জীবনের আদর্শ নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি কোন দিন ঝগড়া করিনি করবও না; তবে দুনিয়ার কাজ বলতে তুমি কি বুঝেচ, তা আমি জানিনে। মানুষ যে এই পৃথিবীর বুকে থেকে কেবল হাওয়ার উপরই ভেসে বেড়াবে, ফুলের মধু পান করবে অথচ কাঁটার খোঁচা খাবে না তা আমি মোটেই বিশ্বাস করিনে।

তুমি চাও পাবার মত করে প্রাণকে পেতে, আমিও তাই চাই। সকল মানুষ, শুধু মানুষ কেন, সকল প্রাণীইত তাই চায়। কিন্তু চাইলেই কি তা পাওয়া যায়? শারীরিক ব্যাধি মানসিক সুখ-দুঃখ, শত রকমের অভাব দৈন্য কি এই প্রাণের স্ফূর্ত্তি লোপ করে দেয় না? যতক্ষণ না তুমি পারচ সে গুলোকে জয় করতে ততক্ষণ হাজার চেষ্টা করে তুমি পূর্ণ করে প্রাণকে পাবে না।

তুমি লিখেচ যে, বাইরের কোন কিছু তোমার ভিতরের আনন্দ নষ্ট করতে পারবে না—নিজের আনন্দে নিজেই তুমি বিভোর হয়ে থাকবে।

পার যদি বিশ্বের গরল-রাশি কণ্ঠে ধারণ করে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকতে, সেত খুবই ভাল কথা—কিন্তু মনে রেখো তেত্রিশ কোটী দেবতার মধ্যে ঐ একটি আনন্দময় প্রাণময় মূর্ত্ত সচ্চিদানন্দ যিনি রাজভোগে ও ভিক্ষান্নে সমানই তৃপ্ত, শ্মশানে ও প্রাসাদে সমানই অভ্যস্ত—প্রলয়ের বিষাণ বেজে উঠলেও যিনি আনন্দে নাচতে সক্ষম।

সামান্য রকমের দু'একটা বেদনার আঘাত উপেক্ষা করতেই এ অহঙ্কার কখনো যেন আমাদের মত্ত করে না তোলে যে, আমরা বাইরের আঘাত অগ্রাহ্য করবার শক্তিলাভ করেচি। যেখানে মানুষ তাকে পূর্ণ করে তুলতে চায় পরিবারের ভিতর দিয়ে, সমাজের আশ্রয়ে থেকে, দেশের ও দুনিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে, সেখানে বাইরের সব কিছু উপেক্ষা করা যায় না।

তুমি অনেক সময় বলে থাক যে, দুনিয়ার কাজে লেগে যাবার মত শক্তি তোমার নেই। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে এর চাইতেও শতগুণে যা কঠিন, দুঃখ দৈন্য দূর করবার জন্য যে প্রবলতর শক্তির আবশ্যক, তা কি তুমি

অর্জ্জন করতে পেরেচ? আমার মনে হয় দুনিয়ার কাজ কারবার চাইতে—দিবানিশি দুনিয়ায় যে কাজ চলচে, তাই অগ্রাহ্য করা অনেক বেশি শক্ত।

তারপর দুনিয়ার কাজ কথাটা আমরা খুব ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করিনে। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ যে ভাবে দুনিয়ার কাজ করেচেন, সে কাজ মানুষের নয় বলেই ত আমরা তাঁদের ভগবানের অবতার বলি। সেই ধরণের কাজ ছাড়া প্রতি মুহূর্ত্তে কত ছোট বড় কার্য্য সমষ্টির ফলে আমাদের বিপুল এই পৃথিবী পলে পলে গড়ে উঠচে—তাতে যে পায়ে-দলা ধূলিকণা হতে সুরু করে উপরের ওই অনন্ত আকাশ পর্য্যন্ত যতকিছু আছে সবারই কিছু না কিছু দান রয়েচে। কেবল মানুষই কি কিছু দেয় নি? আমার মনে হয় দুনিয়া গঠন ব্যাপারে সবার চাইতে মানুষের দানই বেশি—আর সে মানুষের পৌনে-ষোল আনা ঠিক তোমার আমার মতই মানুষ।

তারপর, মেয়েদের প্রতি আমরা অবিচার করচি বলে তুমি ক্ষোভ প্রকাশ করেচ। তোমার মত হচ্চে, চলবার পথ হতে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করে দেওয়া। বেশ কথা। কিন্তু সে কাজ কে করবে? কল্পনার জাল বুনে গুটিপোকার মত কেবল নিজেকে ঘিরে ফেলে চুপটি করে বসে থাকলেই কি সামনেই পথ আপনা হতেই পরিষ্কৃত হয়ে যাবে?

হিন্দুরা মেয়েদের পূজা কোন দিন করেচেন কি করেননি সে বিচারে আমি প্রবৃত্ত হব না। তাঁরা যা করে গেছেন তার প্রমাণ ইতিহাসেই পাওয়া যাবে, যা করেন নি তাও করেছিলেন বলে কৃতিত্ব দেবার মত ভণ্ডামি আমার মাঝে নেই।

আমি আমাদের মেয়েদের দুর্দ্দশা যুক্তি তর্ক প্রয়োগে কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার লোক নই। মর্ম্মে মর্ম্মে আমি অনুভব করচি আমাদের বিরাট দৈন্য যা দিন দিনই বেড়ে চলেচে তা দেশের নারী শক্তিকে অবহেলা করবার ফলে। যক্ষ্মাক্রান্ত রোগীর মত আমাদের এই সমাজ যে একেবারে অন্তঃসার শূন্য হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সকল কাজেই তার পরিচয় পেয়ে তীব্র একটা বেদনা অনুভব করচি। সে ব্যাথা, তোমার চিঠি পড়ে বুঝতে পারচি, তোমার বুকেও বেজেচে। এই ব্যাথা বুকে পুরে রেখে, চুপটি করে বসে থেকে পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি গালি বর্ষণ করলেই আমাদের মেয়েদের দুঃখ দৈন্য বিদূরিত হবে না, ভাই।

মেয়েদের ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকবার মত এতবড় একটা অনিয়ম

আমাদের সমাজে কেমন করে যে এসে পড়েচে, তা আমি ভেবে স্থির করতে পারিনে। এ সম্বন্ধে দেশে যা কিছু আলোচনা হচ্চে, তাতে দেখচি দুটি দলে বিভিন্ন দুটি কারণ নির্দ্দেশ করচেন। এক দল বলেন, বিজেতা-জাতির অত্যাচার ভয়েই আমরা মেয়েদের নিয়ে এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেচি, যেখানে আলো বায়ু পর্য্যন্ত প্রবেশ করে না—অর্থাৎ আমরা ইচ্ছে করে করিনি, জোর করে আমাদের দিয়ে করিয়েছে। অপর দলের উক্তি—অবরোধ প্রথা বিজেতা জাতির ভয়ে নয়, তাদের অনুকরণ করতে গিয়েই সমাজে শিকড় গজিয়ে বসেচে।

এই দুই দলের মতের অ-মিলে বেশি কিছু এসে যায় না, কারণ, উভয়েই স্বীকার করচেন যে, এই প্রথাটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা মোহের বশে আমাদের পেয়ে বসেচে। ধীর স্থির ভাবে বিবেচনা করে, ভাল বলে, ওটা আমরা গ্রহণ করিনি। মুস্কিল হচ্চে আর একটি দলকে নিয়ে, যাঁরা বলেন, মেয়েদের সত্যিকার আসনই হচ্চে ওই গৃহের কোণে—অসূর্য্যম্পশ্যা হলেই নারীর গৌরব বৃদ্ধি পায়। এই দলের লোকেরা আবার চাণক্যের "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজ কুলেষু চ" কথাটা যখন তখন বলে থাকেন; তবে রাজকুলকে অবিশ্বাস করা এবং তা ভাষায় প্রকাশ করা বিপজ্জনক জেনে স্ত্রীকুলকেই দুনো জোরে অবিশ্বাস করতে উপদেশ দিয়ে থাকেন। যাঁরা এ উপদেশ মত কাজ করতে নারাজ এ দলের মতে তাঁরা হচ্ছেন সমাজদ্রোহী। আমরা যে পারচিনে অবরোধ প্রথাকে সমূলে উৎপাটন করতে তাতেই প্রমাণিত হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোকই শেষোক্ত দল ভুক্ত।

ব্যক্তি বিশেষ যখন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তখন সমাজ ত চাইবেই ব্যক্তিবিশেষকে চেপে মারতে—কিন্তু বিশিষ্ট সেই ব্যক্তি যখন সমষ্টির বন্ধন-গ্রন্থি শিথিল করে তার লোকদের স্বপক্ষে টেনে আনবে তখন তাকে নিয়েই সমাজ গড়ে উঠবে; ক্রমে এক ঘরে হয়ে সেই থাকবে যে বিশিষ্ট এই ব্যক্তির আহ্বানে তার গড়া সমাজে এসে যোগ না দেবে। এই জন্যই ত বলা হয়ে থাকে যে মানুষই সমাজ গড়ে,—সমাজ মানুষ গড়ে না।

ব্যাথা যদি পেয়ে থাক, বন্ধু, মেয়েদের অমর্য্যাদা বুঝতে পেরে, তবে সে বেদনা বুকে চেপে রেখে নিজেরই সর্ব্বনাশ করো না। হৃদয়ের সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে চেষ্টা কর নারীশক্তিকে জাগ্রত করতে। তাদের শক্তিশালিনী করে তোল—তা হলেই পুরুষদের মিথ্যা পৌরুষ টিকবে না।

এই সমস্যার আর একটা দিক আছে। আমরা সবাই যে মেয়েদের তুচ্ছ করেই তাদের প্রতি অবিচার করি তা নয়। আর্থিক দুরবস্থায় বাধ্য হয়েই অনেক সময় আমাদের তা করতে হয়। দাসীর কাজ মেয়েদের দিয়ে করিয়ে নেবার প্রয়োজন আমাদের কখনই থাকত না, যদি আমরা সকলেই দাস-দাসী রাখতে পারতাম।

বেলা দশটা হতে সুরু করে একপ্রহর রাত পর্য্যন্ত বিশ্রী রকমে খেটে পুরুষেরা যেখানে দুবেলা পেট ভরে খাবার ব্যবস্থা করতে পারে না, সেখানে মেয়েরাই বা কেমন করে মুক্ত আলো বায়ুর সন্ধানে সকালে ও সন্ধ্যায় দু'চার ঘণ্টা বাইরের অবসর ভোগ করবেন!

আজ আর কিছু লিখব না। আমরা ভাল আছি। আগামীতে তোমার কুশল লিখো। ইতি—

স্নেহাকাঙ্ক্ষী
নরেশ—

নিরুদ্দেশের যাত্রী।

(বাউল—কাশ্মিরী খেম্‌টা)।

[হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম।]

নিরুদ্দেশের পথে যে দিন প্রথম আমার যাত্রা হ'ল সুরু,
নিবিড় সে-কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ-বুক কাঁপ্‌লো দুরু দুরু॥
মিট্‌লোনা ভাই চেনার দেনা, অম্‌নি মুহুর্মুহু
ঘর-ছাড়া ডাক কর্‌লে সুরু অথির বিদায়-কুহু—
উহু উহু উহু!
হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
অম্‌নি বাঁধে ধর্‌লো ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন—
আমি খুঁজি কোন্ আঙনে কাঁকন বাজে গো!
বেরিয়ে দেখি ছুট্‌ছে কেঁদে বাদ্‌লী হাওয়া হু হু
মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মতন,
দেয়ার গুরু গুরু॥
পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, "আর বাঁচিনে! কোথায় প্রিয় কোথায় নিরুদ্দেশ?"
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপ্‌টা মারে নিশীথ-মেঘের আকুল চাঁচর কেশ।
'তালবনা'তে ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয় ব্রজে বাজে তূরী,
মেখ্‌লা ছিঁড়ি পাগ্‌লী মেয়ে বিজ্‌লী-বালা নাচায় হীরের চুড়ি
ঘুরি ঘুরি ঘুরি
ও সে সকল আকাশ জুড়ি।
থাম্‌লো বাদল রাতের কাঁদা,
ভোরে তারা কনক গাঁদা
হাস্‌লো, ও মোর টুট্‌লো ধাঁধা—
হঠাৎ ও কা'র নূপুর শুনি গো?
থাম্‌লো নূপুর, ভোরের তারা বিদায় নিল ঝুরি!
এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যা-তারার চলার পথে গো!—
আজ অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু ঝুরু॥

বর্ত্তমানের সমস্যা।

[শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।]

আজকালকার যুগের মস্ত কথা হইতেছে সাম্য, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য। এই কথাটাই নানা ক্ষেত্রে নানা রূপে নানা নামে জগতের সমস্ত আলোড়ন বিলোড়নের কলহ কোলাহলের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। Self-determination শব্দটি আজ যথা তথা মুখরিত হইতেছে। Sein Fein বল, 'স্বদেশী'ই বল, অর্থ ঐ একই। Socialism, syndicalism sovietism এমন কি "Suffrgeattism" পর্য্যন্ত ঐ একই 'স' অথবা 'স্ব' এর মাহাত্ম ঘোষণা করিতেছে। ব্যষ্টি হউক আর গোষ্ঠী হউক, কেহ আর অপরের কথায় উঠিতে বসিতে চাহিতেছে না, সকলেই চাহিতেছে নিজের ভার নিজে লইতে। মুক্ত

ভাবে নিজের পথ নিজে করিয়া লইতে, নিজের সত্য নিজে খুঁজিয়া জানিয়া লইতে, নিজের প্রতিষ্ঠা নিজে করিয়া লইতে প্রত্যেকেরই অধিকার আছে, অধিকার ত আছেই তা ছাড়া এইটাই কর্ত্তব্য। মানুষের শক্তি এই পথে, মানবজাতির শান্তিও এই পথে—জীবনের সার্থকতার জন্যে নান্যঃ পন্থা।

একটা যুগ ছিল যখন কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম হওয়াটাই সমাজের ছিল নিয়ম ও আদর্শ। তখন কর্ত্তা হইবার অধিকার সকলেরই ছিল না, কারণ সকলেরই সে রকম বিদ্যাবুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য আছে বা থাকিতে পারে তাহা মানা হইত না। স্বভাবের দোহাই দিয়া হউক অথবা কর্ম্মফলের দোহাই দিয়া হউক বলা হইত, মানুষের মধ্যে আছে উত্তম ও অধমের শ্রেণী বিভাগ। উত্তমের কথা অনুসারে চলায় অধমের কল্যাণ। অধম নিজের ভাল নিজে বুঝিতে পারে না, সেই অনুসারে নিজে নিজে চলিবার ক্ষমতাও তাহার নাই; তাই উত্তম তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন, পদে পদে ঠেলিয়া লইবেন। আর এই রকম সমাজেরও হয় সুশৃঙ্খলা। সকলেই যদি স্ব স্ব প্রধান হয়, তবে গোলমালের ত অবধি থাকিবে না; নিজের জন্য নিজে নিয়ন্ত্রিত করিতে গিয়া মারামারি কাটাকাটি হইবে, সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে, তখন 'নিজ' বলিতে কোন মানুষই থাকিবে না। তাই শ্রেষ্ঠ, গুরুজন ও শাস্ত্র মানিয়া চলিতে হইবে। সমাজের কর্ত্তাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিতে হইবে।

সমাজের নানা ক্ষেত্রে এই রকম নানা কর্ত্তা পূর্ব্বকালে উঠিয়াছিলেন। সমষ্টিগত জীবনে আগে আমাদের দেশে ছিলেন ব্রাহ্মণ, ইউরোপে ছিল Church—ব্রাহ্মণে ও শূদ্রে, Church man ও lay man-এ কি রকম সম্বন্ধ ছিল, ইতিহাসে সে কথাটা খুব স্পষ্ট করিয়া ফলাইয়াই লেখা আছে। তারপর আর এক কর্ত্তা ছিলেন রাজা—benevolent (আজ কালকার ভাষায় বলিব non-violent) despotism হউক আর violent despotism হউক রাজাই ছিলেন প্রজার মালিক বা অধিকারী, রাজাই প্রজার ভাল মন্দ নির্দ্ধারণ করিতেন, রাজারই ছিল প্রজার দোষগুণের সব দায়িত্ব, প্রজার নিজস্ব সত্তা বলিয়া কিছু ছিল না। পারিবারিক জীবনে, যিনি ছিলেন কর্ত্তা (Pater familias) তাঁহার প্রভাব, অধিকার, ক্ষমতার ত এক রকম অবধিই ছিল না। সন্তান ছিল পিতার জিনিষ, পিতার প্রীত্যর্থে সব করা, পিতৃপুরুষ দিগকে সন্তুষ্ট করাই ছিল সন্তান সন্ততিদের একমাত্র ধর্ম্ম! পিতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান ত দূরের কথা, পিতার মনের কথা আগে হইতেই জানিয়া যে সেই

অনুসারে চলিতে না পারে সে ত কুসন্তান, মহাপাতকী। তারপর স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সে কথা বিশেষ বলাই বাহুল্য। স্ত্রী আপন অস্তিত্বকে ডুবাইয়া জলাঞ্জলী দিয়া কি রকমে স্বামীর কুক্ষীগত হইয়া গিয়াছেন তাহার নিদর্শন বাংলা দেশে ভারতীয় সমাজে বেশী খুঁজিয়া পাইতে হয় না। তারপর আর এক কর্ত্তা হইতেছেন গুরু, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ যে রকম এক সময়ে ছিল ও এখনও আছে তাহা দেখিয়া বুঝা কষ্টকর শিষ্য একটি সজীব মানুষ, না জড় পদার্থ মাত্র।

এই ত গেল পুরাতন কালের কথা—নূতন কালেও যে এই সব জিনিষের চিহ্ন লোপ পাইয়াছে তাহা নয়, তবে ইহাদের জোর অনেক কমিয়া গিয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পুরাতন কালের কর্ত্তার দল ছাড়া, নূতন কালে নূতন যে কর্ত্তার দল উঠিয়াছে বা উঠিতেছে সে সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। রাজার কর্ত্তৃত্ব আজকালকার যুগে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেখানে আসিয়াছে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব। পুরাতন কালেও রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব যে একেবারেই ছিল না তা নয়—গ্রীসে, স্পার্টায়, রোমের ইতিহাসে ইহার পরিচয় খুবই পাই; কিন্তু তবুও বিশেষ ভাবে এটি হইতেছে আধুনিক যুগের কথা। আজকাল প্রত্যেক দেশবাসীকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, শুধু শিক্ষা দেওয়া নয়, কাজে কর্ম্মে লাগাইয়া জোর করিয়া প্রমাণ করা হইতেছে যে রাষ্ট্র-রূপ যন্ত্রের সে একটা অঙ্গ মাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন সাধনা হইতেছে এই যন্ত্রটাকে ভাল করিয়া চালান, ইহার উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য তাহার সমস্ত শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করা। দেশ অর্থাৎ দেশ-শক্তির কেন্দ্র বা প্রতিনিধি যে রাষ্ট্রশক্তি তাহাই ঠিক করিয়া দিবে প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ও কর্ম্ম, সেইটুকুই সে করিবে, তাহা না করিলে বা তাহা ছাড়া নিজের ইচ্ছামত কিছু করিলে সে হইবে এনাকিষ্ট—আইন ভঙ্গকারী, তাহার স্থান ফাঁসী কাঠে, জেলে। রাষ্ট্র যে কেবল নিজের লোকের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছে তাহা নয়, পরের রাজ্যের উপরও যথাসাধ্য সে কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে চেষ্টা করিতেছে। আগেও অবশ্য এক রাজ্য আর এক রাজ্যকে অধিকার করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিত, এজন্য যুদ্ধ বিগ্রহও হইত যথেষ্ট, সমস্ত ইতিহাসের অর্থই বোধ হয় ত এই ব্যাপার। কিন্তু তখন কথাটা ছিল খুব স্পষ্ট, যে খাইতে চাহিত সে খোলাখুলি বলিত আমি তোমাকে খাইব। কিন্তু আধুনিক যুগে ঠিক সে রকমটি হয় না—আধুনিক যুগে যে খাইতে চায় সে বলে তোমাকে খাইব না, তোমাকে civilise করিব,

আলোকে আনয়ন করিব। ইউরোপের সাদা রাষ্ট্র সব এসিয়ার আফ্রিকার কালো রাষ্ট্র সবকে এই কথা বলিতেছে। Mandatory নেশন সব অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল লোকদিগকে বলিতেছে, তোমরা শিশু তোমাদের ভার আমরা লইলাম, আমাদের স্বার্থ নাই, জগতের মানবজাতির উন্নতি কল্পে তোমাদের শিক্ষা দীক্ষার বন্দোবস্ত আমাদিগকেই করিতে হইবে, আমাদের কথা অনুসারে চলিতে মূর্খের মত ইতস্ততঃ করিও না।

তারপর আর এক কর্ত্তা হইতেছেন 'বড় লোক' অর্থাৎ টাকাওয়ালা। অর্থ যাঁহার যত তাঁহার যে মান সম্ভ্রম শুধু তত তা নয়, তাঁহার ক্ষমতাও তত। তিনি যে শুধু ভাঙ্গিতে গড়িতে পারেন তা নয়, কি রকমে ভাঙ্গিতে হইবে আর কি রকমে গড়িতে হইবে সে জ্ঞান বুদ্ধিও তাঁহারই আছে। দেশে দেশে যে যুদ্ধ বা সন্ধি হয়, তা অনেকখানি ধনকুবেরদেরই সুবিধা অসুবিধা অনুসারে। মাল আমদানী রপ্তানি সরবরাহ হয় তাঁহাদেরই প্রয়োজন বুঝিয়া; জিনিষ তৈয়ারী হয়, ফ্যাসনের প্রচলন হয় তাঁহাদেরই রুচি পরিতৃপ্তির জন্য। গরীব লোকেরা নিজেদের সুখ সুবিধা মত জীবন যাপন করিতে পারে না, তাহাদের সুখ সুবিধা বড় লোকেরা মাপিয়া জুখিয়া দেন। সমাজের যে একটা high tone থাকা দরকার সেটা বড়লোকেরাই বজায় রাখেন ও রাখিতে পারেন—ছোট লোকের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতেছে 'কাঠ কাটা আর জল টানা' (hewers of wood and drawers of water)।

আধুনিক কর্ত্তাদের লিষ্ট অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, যদি আর এক রকর শ্রেণীর কথা আমরা উল্লেখ না করি। সে শ্রেণী হইতেছে মুনিব বা হুজুরদের। মুনিব আর চাকুরে, হুজুর আর মজুর এ সম্বন্ধটা বিশেষভাবে বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার। আজকালকার নীতিশাস্ত্রে একটা নূতন পাপের জন্ম হইয়াছে দেখা যায় তার নাম insubordination—চাকুরে যদি মুনিবের মন জোগাইয়া না চলে, মজুর যদি সর্ব্বতোভাবে হুজুরের আজ্ঞাকারী না হইয়া থাকে তবে সেটা দোষের (crime) শুধু নয়, সেটা হইতেছে পাপ (sin)। কথাটা অতিশয়োক্তি হইল কি? অন্ততঃ ভারতবর্ষে যে নয়, তার প্রমাণ আমরা অনেকেই নিজের নিজের ভিতরে ভাল করিয়া তল্লাস করিলে নিশ্চয়ই পাইব জোর করিয়া বলিতে পারি। দাস প্রথা (serfdom) আগেও ছিল। কিন্তু একটু আগেই যেমন আমরা আর একটা জিনিষের সম্বন্ধে বলিয়াছি, পুরাকালে জিনিষটা ছিল খোলাখুলি, সেখানে কোন লুকাচুরি কোন স্বার্থ ছিল না,

সেটা ছিল খুব শরীরগত ব্যাপার, তারপর তখনকার দিনেও মুক্তির অবকাশ ও সম্ভাবনা ছিল—ছিল যেন অন্ততঃ saturnalia, ছিল reason, কিন্তু বর্ত্তমানের দাসত্ব একেবারে জমাট নিরেট একটুও ফাঁক কোথাও নাই। তারপর এ জিনিষটা ততখানি শরীরের নয়, যতখানি মনের; আগের জিনিষটি ছিল সরল সোজা, কিন্তু এখনকার মধ্যে আসিয়াছে কুটিলতা কার্পণ্য—মানি অথচ মানি না, মনের প্রাণের এক অংশ মানিতে চায় আর এক অংশ চায় না। উপর নীচ এখনকার দিনে আবার থাকে থাকে সাজান; প্রত্যেকেরই আছে দুই রকম ভঙ্গী, উপরের দিকে তাকায় আপনাকে যে পরিমাণে সঙ্কুচিত করিয়া, নীচের দিকে তাকায় আপনাকে সেই পরিমাণে বিস্ফারিত করিয়া। তবে দুঃখের কথা নীচের দিকের তাকাইবার অবকাশ সকলেরই জোটে না। এ ক্ষেত্রেও দেখি মুনিব বা হুজুর যে সব সময় অত্যাচার করিবার জন্যই চাকুরে বা মজুরের উপর প্রভুত্ব করিতে চাহেন তাহা নয়, চাকুরের মজুরের উন্নতি বা মঙ্গলের জন্যই মুনিব হুজুর তাহাদের ভার গ্রহণ করেন।

এই ত হইল অবস্থা। কিন্তু সমাজের জগতের পতিতদের শূদ্রদের মধ্যে একটা চেতনা জাগিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে, কেহই অপর কাহারও ভার লইবার অধিকারী নয়। যে যত ছোট হীন অশক্ত হউক না কেন, সে বড়র উন্নতের শক্তিমানের হাত ধরিয়া চলিবে না, বড় উন্নত শক্তিমানও তাহাকে কৃপা দয়া পরবশে হাত ধরিয়া চালাইতে চেষ্টা করিবে না। মুক্তির মধ্যেই শক্তির প্রতিষ্ঠা। নিজের প্রেরণায় নিজের সামর্থে নিজের পথে প্রত্যেককে চলিতে দাও—ভুলচুক হউক ক্ষতি নাই, ভুলচুকের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজে যে আমি সত্য পাই তাহাই আমার খাঁটি সত্য, ঠেকিয়া যাহা শিখি তাহাই আমার আসল জ্ঞান। ছাত্রকে গুরুমহাশয় পিটাইয়া মানুষ করিবেন না, ছাত্রকে নিজের রুচি নিজের কৌতুহল অনুসারে চলিতে দিতে হইবে। পিতা পুত্রকে আপনার ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে চেষ্টা করিবেন না, পুত্র নিজেই নিজের ছাঁচ খুঁজিয়া গড়িয়া লউক। স্ত্রী স্বামীর প্রতিধ্বনিমাত্র হইবে না, স্ত্রীও আপন সত্তাকে বজায় রাখুক, নিজের নিজত্বকে ফুটাইয়া তুলুক। গরীবেরা সেই ধনীর বিরুদ্ধে, মজুরেরা মনিবের বিরুদ্ধে আপন আপন সত্যকে সত্বকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য জোট বাঁধিতেছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের মানুষ দাঁড়াইয়াছে conscientious objectors রূপে, পরাধীন নেশন ক্রমে ক্রমে step by step নয় কিন্তু একেবারেই স্বাধীন হইতে চাহিতেছে।

কালো জাতি সাদা জাতির mandate স্বীকার করিতে নারাজ। এ যুগ শূদ্রেরই যুগ।

জগতের শূদ্রেরা অধিকারী ভেদ বলিয়া কোন জিনিষ মানিতে চাহিতেছে না। অধিকার সকলেরই সমান। অধিকার বা দাবি অনুসারে সামর্থ আছে কি না তাহা প্রত্যেকে নিজে বুঝিয়া দেখিবে—অপরের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কিছু নাই, তাহা লইয়া মাথাব্যাথারও প্রয়োজন নাই। স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলে আমি যদি গোল্লায় যাই, তবে সে অধিকারও আমার থাকিবে, গোল্লায় যাওয়াটাই আমার তখন সার্থকতা। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু স্বাধীন স্বতন্ত্র হইলে মানুষ গোল্লায় যাইতে পারে না, ক্ষণকালের জন্য একটু বেচাল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভয় করিবার কিছু নাই প্রকৃতির নিয়মই এই রকম ঋজু কুটিল পথ ধরিয়া ঠিক লক্ষ্যে গিয়া পৌছান। স্বাধীন হইলে আয়র্লণ্ড বা ভারতবর্ষ ধ্বংস পাইবে সে ভয়টা আসল ভয় নয়, আসল ভয় হইতেছে আয়র্লণ্ড বা ভারতবর্ষের কর্ত্তাদের বড় অসুবিধা হইবে। রুসিয়া আপন ইচ্ছামত গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিলে রুসিয়ার যে বিপদ হইবে, সেটাকে খুব ফলাইয়া বলি, আসল বিপদ যে ইউরোপের কর্ত্তাজাতিদের হইবে সেই কথা উহাতে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদের মাথার কাছে যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি বাড়াইয়া দেন, তাহা কতখানি শূদ্রদের পারত্রিক পরিত্রাণের জন্য, আর কতখানি নিজেদেরই ঐহিক আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

কিন্তু কর্ত্তাদের দিক হইতে যে কৈফিয়ৎটা দেওয়া যায় সেটা অন্তঃসার শূন্য অথবা তাঁহাদের কথাটা যে একবার প্রণিধান করিবার যোগ্য নয়, তাহা না হইলেও হইতে পারে। কর্ত্তাদের পক্ষে আমরা ওকালতনামা লই নাই, কিন্তু আজকালকার যখন গোড়ার তত্ত্ব লইয়া ভাঙ্গাচুরা হইতেছে তখন সব দিকই নির্ব্বিকার ভাবে সমান নজর দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি। সমাজে বড় ছোট উচ্চ নীচ ব্রাহ্মণ শূদ্র যে একটা বিভাগ হইয়াছে হইতেছে সেটা দেখি সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের জিনিষ—সুতরাং তাহাকে সমাজের একটা স্বাভাবিক অভিব্যক্তি না বলিয়া থাকা যায় না। বড় যারা, উচ্চ যারা, ব্রাহ্মণ যারা তাহারা যে এক সময়ে যুক্তি করিয়া জোট বাঁধিয়া এমন দুষ্কার্য্যটি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ রকম বলিলে মানুষসম্বন্ধে সমাজসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। এই যেমন Faminist বা Suffragettedের মুখে একটা কথা

অহরহ শোনা যায় যে মেয়েরা স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য বিহীন হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষের ছায়ায় পুরুষের পদতলে পতিত রহিয়াছে, সেটা হইতেছে পুরুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার কারসাজি—পুরুষেই সমাজ গড়িয়াছে নিজের সুখ সুবিধার জন্য। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এটা কি সম্ভব? সমাজ যদি পুরুষেই গড়িয়া থাকে, তবে গড়িবার সময় মেয়েরা কোথায় ছিল? মেয়েরা কেন তখন প্রতিবাদ করিল না বা নিজেদের সুবিধামত সমাজকে গড়িতে পারিল না? যদি বল, পুরুষেরা জোর জবরদস্তি করিয়া বা ক্রুদ্ধ হইয়া ভাগাইয়া এরূপ করিয়াছে—কিন্তু মানবজাতির এক অর্দ্ধেক আর অর্দ্ধেককে এমন ভাবেই ভেড়া বানাইয়া ফেলিল, বিশেষতঃ দুই অর্দ্ধেকের সম্বন্ধ যখন এমনতর যে একজনের সাহচর্য্য সহযোগীতা ছাড়া আর একজন একপদও অগ্রসর হইতে পারে না? আর ইতিহাসে জোর জবরদস্তির—সে ভুলানের ভালানের প্রমাণ কোথায় দেখিতে পাই কি? বলা যাইতে পারে, জিনিষটি আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিয়াছে, এক দিনে হয় নাই, মেয়েরা আজ দেখিতে পাইতেছে তাহারা কি রকমে ধীরে ধীরে জালের মধ্যে পা দিয়া ফেলিয়াছে। কথাটা সত্য হইতে পারে—কিন্তু ইহাতে পুরুষের দোষ নাই, পুরুষেরা সজ্ঞানে দুষ্ট বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে এ কাজ করিয়াছে তাহা নয়। সমাজের একটা প্রেরণায়, স্বভাবেরই টানে পুরুষ এই ভাবে চলিয়াছে, শুধু তাই, নয়, মেয়েরাও তাহা মানিয়া লইয়াছে। এই শেষ কথাটা আমরা সহজেই ভুলিয়া যাই, কিন্তু সেইটাই আসল কথা। মেয়েরা যে পুরুষের উপর এত নির্ভরশীল, পুরুষের ছায়া বা প্রতিধ্বনির মত হইয়া উঠিয়াছে তার গোড়ার কারণ, মেয়েদের স্বভাবে নিশ্চয়ই এই রকম একটা জিনিষ আছে, এই রকম হওয়ায় মেয়েরা একটা আনন্দ একটা তৃপ্তি একটা সার্থকতা পাইয়াছে। হইতে পারে, পুরুষেরা শেষে মেয়েদের এই দৌর্ব্বল্য টের পাইয়া, আরও সুবিধা করিয়া লইয়াছে, বাঁধনটা আরও কসিয়া ধরিয়াছে। মেয়েরা অভ্যাসক্রমে অন্ধভাবে তাহাতে সায় দিয়েছে; কিন্তু এটা গোড়ার সত্য নয়। সেই রকম শূদ্রেরাও যে ব্রাহ্মণের পদতলে, তার কারণ ব্রাহ্মণের আত্ম প্রতিষ্ঠার লোভ হইতে পারে, সমাজের জন্য একটা বিশেষ আদর্শ ও সাধনা স্থাপনের চেষ্টাও হইতে পারে, কিন্তু আর একটা কারণ ব্রাহ্মণের পদতলে থাকিয়া শূদ্রের নিজেরই একটা লোভ বা তৃপ্তি। ভারতবর্ষ যে বিদেশীর অধীন, এসিয়া বা আফ্রিকা যে ইউরোপের খাসমহল, কালা লোক যে সাদা লোকের খেলার পুতুল, তার কারণ একের

ছল বল কৌশল হইতে পারে কিন্তু তাহাতে অপরের সম্মতি, তৃপ্তি যে কিছুই নাই তাও বলা চলে না।

বড় যে ছোটর উপর কর্ত্তৃত্ব করে, তাতে বড়র অভিমান আছে অনেকখানি সন্দেহ নাই ; কিন্তু কর্ত্তৃত্বের পাত্র হইয়া ছোটরও যে কিছু অভিমান নাই তাহাও নয়। আমি এমন মনিবের চাকর, আমি এমন হাকিমের হুকুমদার এই বলিয়া আমি যে গর্ব্ব অনুভব করি সেটাও ত কম সত্য নয়। গুরুর গুরুত্বকে বাড়াইয়া কমাইয়া, আপনাকে দীনাতিদীন মনে করিয়া শিষ্যই যে চরিতার্থ হয়। আমি নিজে সামান্য অশনভূষণে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, কিন্তু আমার রাজাকে আমি দেখিতে চাই ছত্র চামর, আশা সোটা, লোকলস্করে পরিবৃত করিয়া। ধনীর ঐশ্বর্য্যকে দেখিয়া সব সময়ে যে ঈর্ষান্বিতই হই, তা নয়, বরং সেটা নিজে দেখিয়া অপরকে দেখাইয়া কি একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করি। বড়র পূজা বলিয়া মানুষের মধ্যে আছে যে একটা স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাই বড়র বড়ত্বকে টিঁকাইয়া রাখিয়াছে। বড় ছোট যদি না থাকে, সকলেই যদি সমান হয়, তবে মানুষের এই বৃত্তিটির গতি কি হইবে? আর এটা যদি এমন স্বাভাবিকই হয় তবে 'স্ব স্ব প্রাধান্য' জিনিষটি সমাজে আসিবে কি করিয়া?

অপর পক্ষের উত্তর, যাহা স্বাভাবিক তাহাই আদর্শ নয়, যাহা অতীতে ছিল বর্ত্তমানে চলিয়াছে তাহাই ভবিষ্যতের চিত্র নয়! আর স্বভাবের গতি বিচিত্র, নানামুখী। অতীতে বর্ত্তমানে এক রকম স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া সমাজে এক রকম শৃঙ্খলা এক রকম আদর্শ উঠিয়াছে। সে শৃঙ্খলার সে আদর্শের ভোগ হইয়া গিয়াছে। Slave menalityর যে সত্য সেটা ভবিষ্যতের কথা নয়। মানুষকে আর এক রকম mentality পাইতে হইবে, আর এক রকম স্বভাব আর এক রকম আদর্শ সমাজে জগতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আধুনিক যুগের সকল বিপ্লব বিলোড়ন দিতেছে সেই মন্ত্র।

গুরু ও শিষ্য।

[শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।]

১।

শিষ্য আসি' দাড়াল নমি' 'গুরুজী মহারাজ!'
কহেন গুরু, "পাগল কেন করিছ হেন কাজ
হাটের মাঝে ছোট কি বড়
হাজার লোক হইল জড়ো
আমারি দেওয়া মন্ত্র তুমি শুনালে নাকি আজ!
বলিল কেরে করিতে তোরে এমন পাপ কাজ?"

২।

"গুরুর কাছে গৃহীত বীজ রাখিতে হয় বুকে
গোপনে তরুবীজের মত, আনিতে নাই মুখে,
সাধন-বারি সেচন ফলে
পরম গুরু করুণাবলে,
ভক্তি-লতা অঙ্কুরিতা দেখিবে পরে সুখে,
বীজের মত গোপনে অতি জপিতে হয় বুকে।"

৩।

আনত শিরে চরণ চাই শিষ্য কহে "স্বামি!
আজিকে শুধু নহে ত, আমি শুনাই দিনযামী!
ত্রিতাপে পাপে আত্মহারা
জ্বলিয়া মরে জগৎ সারা
তোমার কাছে এ সুধা পেয়ে বাঁচিব শুধু আমি,
হেথা, যাতনা ভরা বিপুলা ধরা কাতরে কাঁদে স্বামি!

৪।

"হাটের মাঝে ঘোষে গো তাই, নামের হোক জয়,
আমি অপরাধে নরকে যাব করি না তা'তে ভয়!

এ সুধা দেবো সবার মুখে,
সবার পাপ বহিয়া সুখে
হাজার বার জনম নেব (যদি) মুক্তি নাই হয়,
তবু, 'নামের' জয়, 'নামীর' জয় ঘোষিব জগৎময় !"

৫।

গুরুজী কন, "ধন্য আমি, তোমার নাম দাতা,
"গুরুজী কন, শুনিতে এই অমিয়া মাখা গাথা !
মুক্তি তব চরণ তলে
লুটে যে দাসী হইবে বলে।
দয়াল "নামী" কেনা যে তোর ধন্য পিতামাতা।"
শিষ্য কহে জয়রে "নাম" "নামী" ও "নামদাতা।"

সুখের ঘর গড়া।

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।]

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

চেতলা মুলুকের জমীদার রতনরায় স্বনাম ধন্য পুরুষ। সে মুল্লুকের লোকে বলিত তাহার প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত! এখনো তাঁর প্রবল প্রতাপের স্মৃতি দুঃস্বপ্নের বিভীষিকার স্মৃতির মত প্রজাবর্গকে চমকাইয়া তোলে। রতনরায় নিজে বনেদীবংশের ছেলে ছিলেন। তিনি নিজে ৺রামজয় রায়ের পোষ্যপুত্র। রামজয়ের পত্নী ভুবনেশ্বরী দেবী মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দত্তকপুত্র লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রামজয়ের এক ভাগিনেয় ছিল, তাহার প্রতি পুত্রবৎ বাৎসল্য থাকায় ইঁহার ইচ্ছা ছিল ভাগিনেয়কে উত্তরাধীকারী করিয়া যাইবেন; ভুবনেশ্বরীর কিন্তু ননদ পুত্রের উপর আদৌ অনুরাগ ছিল না; কিন্তু স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিবার ইচ্ছা বা সাহস হইল না। তিনি অন্যত্র [illegible] দিনপাত করিলেন; রামজয়

মৃত্যুকালে পত্নীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যান; ভুবনেশ্বরী নিজ ভগ্নী-পুত্র রতন-রায়কে পোষ্যপুত্র লইলেন; কিন্তু ভাগিনেয় বিরাজ মোহনকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন না। সে যেমন খাইয়া দাইয়া তাহার আশ্রয়ে মানুষ হইতেছিল, তেমনি হইতে লাগিল। রতনরায়ের ঐশ্বর্য্য লাভের প্রধান সহায়ক তাহার বড় ভাই মোহন রায়। এই মোহন রায়ের একটী মাত্র পুত্র ছিল, তাহার নাম ভবানী প্রসাদ। মোহনের বিষয় বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল, যতদূর সম্ভব ন্যায় পথে থাকিয়া আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা তাহার জীবনের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান ছিল। রতনরায় পোষ্যপুত্র ভাবে গৃহীত হইলে মোহন ভাইএর জমীদারীর দেখা শুনা করিতে লাগিল। বিষয় সম্পত্তি গুছাইয়া দিয়া মোহন মাতৃহীন পুত্রকে রতনের হাতে দিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় লইল। রতন ভবানী প্রসাদকে আপনার ছেলের সঙ্গে সমান স্নেহে মানুষ করিতে লাগিল।

তারপর রতন রায়ের পুত্র প্রসাদ হঠাৎ তিনদিনের জ্বরবিকারে মারা গেলে বৃদ্ধ রতন রায়ের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা ভবানীর উপর পড়িল। পুত্রশোক সহ্য করিতে না পারিয়া রতন-পত্নী ইহলোক ত্যাগ করেন। পুত্রবধু নয়ন-তারা সংসার অনভিজ্ঞা বালিকা বলিয়া গৃহিণীপণার ভার পড়িয়াছিল রতনের শ্যালক-পত্নী কাদম্বিনীর উপর। ভগ্নীপতি মহেশ চৌধুরী শ্যালকের ভাগ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এবাড়ীতে আস্তানা বসাইয়াছিলেন। কাদম্বিনী ননদের সেবা করিতে আসিয়া এই খানেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন।

মহেশ ও কাদম্বিনী যখন আসিলেন তখন অগত্যা উহাদের গুণধর পুত্র জলধরও পিসে মহাশয়ের স্কন্ধে না থাকিবে কেন? সেও আসিল।

কাণ টানিলে যেমন মাথা আসে তেমনি মহেশ ও কাদম্বিনী যখন আসিল তখন তাহাদের পোষ্য যে যেথা আছে তাহারাও আসিবে। ফলে মহেশের গুণধরপুত্র হারাণ, কন্যা হরিদাসী ও বিধবা বাতিকগ্রস্তা কলহপ্রিয়া এক বৃদ্ধা ভগিনীও রতনরায়ের পোষ্যবর্গের অন্তর্গত হইল। পুত্র হারাণ এর আগেই বিদ্যালাভে প্রবৃত্তির অভাবে নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করিয়া কলিকাতার এক মার্চেন্ট আপিসে চাকরীতে ঢোকে। আপিসের কর্ত্তাদের মতে কোনো একটা বে-আইনি কাজ করায় তার চাকরী যায়; কিন্তু দেশে আসিয়া সে প্রচার করে কলিকাতায় স্বাস্থ্যের সঙ্গে তার স্নায়ুযন্ত্রের বিরোধ বাঁধায় সে চাকরী ছাড়িতে বাধ্য হয়। গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া সে মাথার চিকিৎসার

জন্যে সিদ্ধি চরস ধরে। তার পর মামার বাড়ীতে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহার লেখাপড়ার উপর আবার খেয়াল চাপে, সেটা বেশী ভাগ বাপ মায়ের শাসনে তাড়নে ও পরামর্শে। মাস কয়েক পরে হারান নিজেই বুঝিতে পারে তার স্নায়ুযন্ত্রের সঙ্গে ছাপার বই কোনো মতে সামঞ্জস্য রাখিতে চাহিতেছে না; রোগ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কাজেই বাপ মা ছেলের অমূল্য স্বাস্থ্যরত্নের দুর্ভাবনায় বাজে খাটুনি বন্ধ করিয়া দিলেন। মহেশ বুঝিল বাজে ইংরাজি বিদ্যার চেয়ে জমীদারী সেরেস্তার কাজেই হারাণের স্নায়ু-যন্ত্র খেলিবে ভাল। কাছেই পীরবাজার নামক একটা ছোট পত্তনী মহলে হারাণকে ছোট নায়েব করিয়া পাঠানো হইল। পীর বাজারে কয়েক মাসের মধ্যেই হারাণ স্থানীয় জেলেপাড়া হইতে একটী মৎস্যগন্ধা হরণ করিয়া তাহার সহিত পাঁরাশরী অভিনয় করার ফলে একটা বিশ্রী এপিসোড্ ঘটে। রতনরায় ভাগিনেয়কে ফিরাইয়া আনিয়া ঘরে বসাইয়া রাখেন। হারাণ তখন পৈতৃক নেশার পেশায় মনোনিবেশ করিল। গোলা বাড়ীতে সাঙ্গ উপাঙ্গ সংগ্রহ করিয়া সে বাপ্‌কা বেটা এবং সেপাইকা ঘোড়া এই প্রবচন দুটীর সার্থকতা দেখাইতে সুরু করিল। হারাণের প্রধান অন্তরঙ্গ সঙ্গী হইল আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ব্রহ্মঠাকুরাণীর ভাইপো লুটবিহারী।

মহেশ ও মহেশ-জায়ার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটা অপ্রকাশ্য উচ্চ আশা এই একমাত্র বংশধরকে কেন্দ্র করিয়া লোক-লোচনের অদৃশ্য থাকিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহা এ বাড়ীতে ধরিতে পারিয়াছিলেন কেবল মাত্র বুদ্ধিমতী নয়নতারা। পরে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রতনরায় জমীদারী পাইয়া সাবালক হওয়া পর্য্যন্ত দাদার যুক্তি পরামর্শ অনুসারে চলিত। সাবালক হওয়ার পরও দাদার মৃত্যু ঘটায় তাহার দায়িত্ব বাড়িল কিন্তু বিষয় কাজে মন দিবার প্রবৃত্তি হইল না। এই সময় ভগ্নীপতি মহেশ আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রতনকে অনেকটা নিশ্চিন্ত করিল। রতনের হঠাৎ বৈভব লাভের সঙ্গে সঙ্গে 'জীবন-সম্ভোগের' বাসনা বাড়িল, কেন না ঐশ্বর্য্যই সুখের সোপান। মহেশ সুবিধা বুঝিয়া বাসনানলের মনোমত বিবিধ ইন্ধন যোগাইয়া বুদ্ধিমানের মত ভাগ্যবানের ঘোড়ায় চাপিয়া লইতে লাগিল। এমনি করিয়া রতন রায়ের যৌবন মধ্যাহ্ন কাটিয়া অপরাহ্ণের আবির্ভাব হইল।

রতনরায়ের মনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নাম যশের আকাঙ্ক্ষা জাগিল। রতন

রায় সরকারী-উপাধি ও তক্‌মা লাভের জন্য অস্থির হইল। এবং বুঝিল এ যশোমন্দিরেরও সোপান এই ঐশ্বর্য্য। রতন রায় দুই হাতে অর্থের অপব্যয় আরম্ভ করিল। শেষ দিকে 'রাজা' হইবার নেশায় তাহাকে বিষম রকমেই পাইয়া বসিল। ব্যয়িত অর্থকে পুনঃ সঞ্চিত করিবার যে সব মামুলী জমীদারী উপায় তাহা মন্ত্রী ভগ্নীপতি সাহায্যে অবলম্বিত হইতে লাগিল। নির্জ্জীব রসহীন প্রজাবর্গের হাড়-মাংস নিংড়াইয়া সেই অর্থের পুনরাগম হইতে লাগিল। প্রজাবর্গ প্রবলপ্রতাপের সবল অভিনয়ে ত্রস্ত, ব্যস্ত ও সশঙ্কিত হইয়া পড়িল।

জমীদারের ইন্দ্রিয়-লালসার ও যশঃপিপাসার বহ্নিতে ইন্ধন জোগাইতে গিয়া জমীদারীর যে অবস্থা দাঁড়াইল তাহা সহ্য করিতে পারিল না ভবানীপ্রসাদ। ভবানী অন্য ধাতের ছেলে ছিল। চোখের উপর অসহায় প্রজাবৃন্দের এই অত্যাচার দেখিয়া সে খুড়ামহাশয়ের কার্য্যের পোষকতা তো করিতই না বরং সময় অসময়ে সৎসাহস দেখাইয়া খুড়ার যথেচ্ছাচারে বাধা দিত; ফলে খুড়া ভাইপোতে একটা মনোমালিন্য ঘটিল। এ বাড়ীতে খুড়ার এই যথেচ্ছাচার এবং পিসে পিসীর প্রবল সহযোগ দেখিয়া তার অবস্থা অতিষ্ঠ হইয়াছিল। একমাত্র তার সান্ত্বনার স্থল ছিল মাতৃসমা বৌদিদি নয়নতারা! উভয়েরই এক অবস্থা, একভাব, এক দুঃখ। নয়নতারা এখন আর বালিকা বধূ নন। গৃহিণী হইবার মত বুদ্ধি বিবেচনা ও বয়স হইয়াছে; কিন্তু পিসিশাশুড়ীর প্রবল প্রতাপে তিনি বিরক্তি ও ঘৃণা বোধ করিয়া সংসার হইতে হাত গুটাইয়া ঠাকুর দেবতার চিন্তায় কাল কাটাইতে লাগিলেন। সংসারে না থাকিলে নয় তাই থাকা। পুত্র তুল্য এই দেবরের প্রতি একমাত্র মায়ায় তিনি বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই ইহকালে এই একমাত্র স্নেহের খুঁটীতে মনটীর এক প্রান্ত বাঁধিয়া অন্য প্রান্তটী তিনি পরকালের চিন্তার দিকে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া ছিলেন। সংসারের অন্য সব ব্যাপারের 'হাঁ' বা 'না' কিছুতেই বড় গা দিতেন না।

ভবানীপ্রসাদও ইদানীং বড় আর দেশের বাড়ীর ধার মাড়াইত না। পড়া শুনা ও স্বাস্থ্যের অছিলায় কলিকাতাতেই পড়িয়া থাকিত। কেবল বৌদিদির স্নেহের আহ্বান পাইলে সে বাড়ী আসিত। নচেৎ নয়। ভবানী প্রসাদের এরূপ বৈরাগ্যের বিশেষ কারণ হইয়াছিল। যদুপাল নামে জনৈক প্রজা বাকী খাজনা না দিতে পারায় তাহার একমাত্র সম্বল বীজধান বাজেয়াপ্ত হয়। যদু ভবানীর কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়ে। ভবানী তাহাকে মুক্তির আশ্বাস দিয়া

খুড়া মহাশয়ের কাছে যদুর নিষ্কৃতি ভিক্ষা করে। রতনরায় তখন মহেশের সহিত বসিয়া কমিশনার সাহেবের জন্য নজরের ডালি দিবার ফর্দ্দ করিতে ছিলেন। ভাইপোর আবেদন শুনিয়া আল্‌বোলার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া চশমাটা কপালের উপর তুলিয়া দিয়া বলিলেন—"আজ আবার কার মাম্‌লা ?"

ভ। যদুপালের বীজধান বাজেয়াপ্ত হলে ব্যাচারী কি খাবে ?

রতন। (নীরবে চাহিয়া থাকিয়া) হু! গ্রীষ্মের ছুটী ফুরুতে আর ক'দিন ?

ভ। আর বারো দিন।

রতন। ছুটী ফুরুলে আর কলেজ গিয়ে কাজনি—এই গদিতেই বসে জমিদারী চালিও। সোজা কথা—

ভ। আমি কি তা চাইছি, কাকা বাবু ?

রতন। চাইতে হবে কেন ? তুমি যখন এমন লায়েক হয়েছ তখন আমি কেন বুড়ো বয়সে আর বিষয়ের পাঁক গায়ে মাখি—সোজা কথা নয় কি ?

ভবানী নীরব। একে গুরু জন, তার উপর অসন্তোষ-জ্ঞাপক শ্লেষ বাক্য! সে চুপ করিয়া থাকিল।

মহেশ উত্তর করিল—"বাবাজীবন! কিসে কি কর্ত্তব্য রায় মহাশয় ভাল জানেন—তোমরা ছেলে ছোকরা এতে কেন—

রতন। থামো মহেশ। ওরই তো বিষয় সম্পত্তি; দু'দিন পরে ও পাবে; আমাদের কেবল ম্যানেজারী করা, ও যদি বোঝে এ ক্ষেত্রে এই কর্ত্তব্য ও ক্ষেত্রে ওই কর্ত্তব্য অর্থাৎ এ সব ব্যাপারে নায়েক হয়েছে তা হলে ওই সব করুক—(চুপ করিয়া) বাপু জমীদারীও রাখবো, আবার দয়া ধর্ম্ম দেখিয়ে খুড়োকে টেক্কা দেবো লোকের প্রিয়পাত্র হবো এরকম দু'দিক বজায় থাকে না—আমার কর্ত্তব্য আমি করছি—তোমার কর্ত্তব্য তুমি করবে যখন তোমার মাথার ওপর উপরিওলা কেউ না থাকবে—এই সোজা কথা—

ম। যখন তখন প্রজাদের হয়ে বাবাজী এই যে ধরতে কইতে আস এতে ওদের আস্পর্দ্ধা বেড়ে—

র। থামো মহেশ! ওকে বুঝতে দাও, আমাকে বোঝাতে দাও—জমী দারী রাখতে হলে—

ভবানী অধৈর্য্য হইয়া বলিল—আমায় মাপ্ করবেন আমি আর কোনো কথায় থাকবো না—

র। অন্ততঃ আমি যদ্দিন বেঁচে আছি আর জমীদারী যদ্দিন আমার অধিকারে আছে। সোজা কথা—

ভবানী প্রসাদ চলিয়া গেল। সে আর তদবধি কোনো কথায় তো থাকিতই না এবং পারত পক্ষে খুড়ার ত্রিসীমানায় ঘেঁসিত না।

এই ঘটনার পর ভবানী প্রসাদ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে সে আর দেশে আসিবে না। লেখাপড়া শেষ করিয়া শিক্ষা বিভাগে কোনো একটা চাকরী লইয়া জীবন কাটাইয়া দিবে। কিন্তু তাই কি হয় ? না পারা যায় ? তার ইহজীবনের পরম আশ্রয়, স্নেহের তপ্তনীড় বৌদিদির কোলখানি খালি করিয়া কি দুর্ব্বল ডানা মেলিয়া আকাশের মেঘ ঝড়ে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে সে পারে ?

তার দুঃখ এই যে সে এখন আর ছোট ছেলেটী নয়; শিক্ষিত বুদ্ধিমান বিবেচক যুবা পুরুষ। নিজেকে সে এই জমীদারীর ন্যায্য উত্তরাধিকারী মনে করে। লোকেও তার কাছে অনেক প্রত্যাশা করে; কাজেই ভাবী জমীদার যে ইচ্ছা করিলে দায় বা দৈবে তাহাদের উপকার করিবে এ আশা প্রত্যাশা অন্যায় অসম্ভব নয়। কিন্তু ভবানী যখন দেখিল যে কোনো ক্ষেত্রেই সে অসহায় উৎপীড়িতকে আশা আশ্বাস দিয়া উপকার করিতে পারিতেছে না, তখন তার মন ভাঙিয়া পড়িবারই কথা। এবার সে বাস্তবিকই বড় লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। ছুটীর এখন ১০।১১ দিন বাকী থাকিলেও সে স্থির করিল চলিয়া যাইবেই। পাছে বৌদিদি মনে আঘাত পান এই ভয়ে সে একটী অছিলা করিয়া ছুটী লইতে গেল।

নয়নতারা তখন পূজানিরতা। বেলা এগারোটারও বেশী। ভবানী ধীরে ধীরে পা টিপিয়া আসিয়া ঠাকুর ঘরের এক পাশে জানালার কাছে বসিয়া বৌদির পূজাশেষের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

জানালার ভিতর দিয়া সে অন্দরের ফুল বাগানের দিকে চোখ মেলিল। ঝরা শিউলিফুলে কচিঘাসের কার্পেট ভরিয়া গিয়াছে। রং বাহারে দোপাটীর সার কার্পেটের পাড়ের মত দেখাইতেছে। এক কোনে একটা কলকে ফুলের গাছ। তার পাশে একটা পঞ্চমুখী জবা রক্তলোচনের মত লাল; তাহারি ডালপালা জড়াইয়া একটা নীল অপরাজিতা নীলমণির হারের মত জবার ডাল-পালা গুলি জড়াইয়া রহিয়াছে। কার্পেটের মাঝখানে একটা গোল জায়গা জুড়িয়া নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকার ঝাড়। এই বাগানটী আর এই জানালার

ধারের আসনটা নয়নতারার বড় প্রিয়স্থান। তারই বিপরীত দেওয়ালে নয়নতারার স্বামীর একটা সমগ্র-মূর্ত্তি ফটো। ছবিটী টাটকা শিউলিফুলের মালায় রোজ শোভিত ও পূজিত হয়। তারি নীচে স্বামীরই অঙ্কিত নয়নতারার নিজের একটা রংচিত্র ; ছবির সঙ্গে আসলের কোন সাদৃশ্য নাই। অন্নদাপ্রসাদ ছবি আঁকিতে শিখিয়াই প্রথমেই পত্নীর এক চিত্র আঁকেন। এই ছবি দেখিয়া অন্য কেহ আসলের সঙ্গের নকলের কোনো সদৃশ্য দেখিতে পাইত না। পাইত কেবল অন্নদা নিজে ও নয়নতারা। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিলে অন্নদা বলিতেন,— "আসলটাকে আমার মন যেমন দেখতে চায় বা দেখে, আমি তারি নকল করিছি ; আসলে আসলটী লোকের চোখে যেমন, আমার চোখে তেমন নয়, এতো ঠিক ? আমি যদি আমার মানসী মূর্ত্তিকে না নকল করি তা হ'লে false art (ঝুটাকলা) হবে, যাকে বলে ফটো তোলা তাই হবে ? পোট্রেট্ চেহারা-চিত্রের এইটে হলো highest সব চেয়ে উঁচু কারচুপি ! তা না হলে হুবহু নকল করে একটা form বা মূর্ত্তি খাড়া করায় বাহাদুরী কি ? যে চেহারা চিত্রে portraitএ ভিতরের আসল মানুষটা না ধরা দিলে সে ছবি ছবিই নয়। ধর, নেপোলিয়ন্ বা ফ্রানসিসের যে চিত্র আঁকা হবে তাতে চেহারার আকারটা রেখায় ফুটিয়ে তোলাটাই শিল্পির বাহাদুরী নয় ; বাহাদুরী হচ্চে ব্যক্তিবিশেষের মূর্ত্তিমান তেজ, বীরত্ব, দম্ভ বা ত্যাগ, বৈরাগ্য ভগবদ্ভক্তিকে ফুটিয়ে তোলা। লোকে দেখলেই বুঝবে এইটে আসল নেপোলিয়ন বা এইটে আসল সেণ্ট ফ্রান্সিস্ ! ভাল শিল্পী মনের রং দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বটাকে ফুটিয়ে তোলে।" যে সময় ও যাহার সহিত তর্কচ্ছলে অন্নদা এই সব কথার ব্যাখ্যা করেন তখন ভবানী উপস্থিত ছিল। তাহার সমস্ত কথা মনে পড়িল। এ ছবিখানি যে সময়ের নয়নতারা তখন ১৪ বছরের। এখন নয়নতারার বয়স ৩০।৩২ হইবে, ভবানী অনেকক্ষণ ছবিটির দিকে তাকাইয়া তারপর আসলের দিকে তাকাইল। নয়নতারা সেই মাত্র পূজা শেষ করিয়া দেবরের দিকে তাকাইলেন। দুই জনে চোখোচোখি হইল। নয়নতারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখছ ঠাকুরপো ?"

ভ। দাদার আঁকার ছবির সঙ্গে তোমাকে মেলাচ্ছিলাম, বৌদি।

ন। মিললো—?

ভ। এতদিনে যেন বুঝছি, ঠিক মিলেছে সত্যি বৌদি। আমরা তখন ঠাট্টা করতাম দাদা তোমাকে ভুল করে বাড়িয়ে এঁকেছে তুমি তখন কি অত গম্ভীর আর অত সুন্দর ছিলে ?

ন। এখন খুব গম্ভীর আর সুন্দর হয়েছি ?

ভ। হ্যাঁ বৌদি। দাদা তোমায় ঠিক দেখেছিলেন আর বুঝেছিলেন — তখন আমরা বলতাম, ঐটুকু পাতলা মিন্ মিনে বউ, আর দাদা এঁকেছেন যেন গিন্নিবান্নি গম্ভীর এক লক্ষ্মী ঠাকরুণ ! এতদিনে তুমি আর তোমার ছবি দুজনের মিল হয়েছে ! বেশ 'মা' 'মা' চেহারা হয়েছে।

নয়ন। তা যেন হলুম ! তুমি হঠাৎ এখন কি জন্যে এলে ?

ভ। একটা পরামর্শ চাই, তোমার পুজোর ব্যাঘাত হলো ?

নয়ন। না না ; পুজোর আবার ব্যাঘাত হয় ? কি পরামর্শ ?

ভবানী। আচ্ছা, বৌদি, আমি যদি আর বাড়ী না আসি ? কলকাতাতেই থাকি ?

নয়ন। হঠাৎ এ কথা কেন ?

ভ। কি লাভ এখানে থেকে ? লোকে জানে আমি জমীদারের ভাইপো ভাবী জমিদার ; বিপদে আপদে পড়লে লোকে এসে আমায় ধরে ; যদি তাদের কোনো উপকার করতে না পারি তবে মিছে এখানে থেকে চোখে এসব দেখা কেন ?

ভবানী সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। নয়নতারা শুনিয়া বলিলেন—'বলতে পার, কিন্তু তার জন্যে ঘর বাড়ী ছেড়ে উদাসী হতে হবে ? আচ্ছা ঠাকুরপো আমি যদি তোমার মা হতাম তা হলে এই অভিমান করতে পারতে ? তুমি ঘর বাড়ী ছেড়ে বিদেশে চলে গেলে আমার কষ্ট হবে না ?

ভ। তুমিও চলো কলিকাতার বাসায় থাকবে —আমার সেখানে একলা বড় অসুবিধে হয়, খাওয়া পরার ভারি কষ্ট

ন। তা জানি, যেতেও পারি, আমার এখানে কিসের মায়া ? কিসেরই বা বন্ধন, ভাই ? তবু যাইনি কেন জান ?

ভ। না, ধর্ম্ম কর্ম্মর বার ব্রতের অসুবিধা হবে, নয় ?

ন। পাগল ! ধর্ম্ম কর্ম্ম কি জায়গার ওপর ভাই ? তা নয়—বাবা তো আর চিরকাল নন ; তাঁর অবর্ত্তমানে এ জমিদারী তোমার তা জানো ? নানাকারণে এর উপর আমার একটু নজর রাখতে হয়, তুমি ছেলেমানুষ সব বোঝ না, বিষয় সম্পত্তিতে শনির নজর পড়েছে, যদিচ আমি মেয়ে মানুষ, হাতে কলমে কিছু করতে পারিনি, তবু যা পারি নজর রেখে চলছি।

ভ। যায় যাক্, থাকে থাক্, আমার তাতে লোক্‌সান নেই বৌদি—

জমীদারের ছেলেও নই, বনেদী চালও নয়, যে সম্পত্তি না হলে মারা যাব—

ন। ওই কি কথা হল, ঠাকুরপো? লেখা পড়া শিখেছ:তো? তোমার নয় কিন্তু আইনমতে তোমার হাতে তো একদিন আসবে? ধর না ভগবান তোমাকে অছি নিযুক্ত করছেন, তুমি ইচ্ছে করলে তো লোক জনের দেশের দশের উপকার করতে পার? এ সুযোগ তুমি ছাড়বে কেন? ধর যদি একজন পুষ্যিপুত্তুরের হাতে পড়তো?

ভ। ভাল কথা মনে করে দিয়েছ, বৌদি! আচ্ছা, তুমি কেন পুষিপুত্তুর একটী নাও না?

ন। (হাসিয়া) কি দুঃখে?

ভ। পরকালে জল পাবে, বংশ রক্ষে হবে!

ন। আমার শ্বশুরের বংশ তোমা হতে থাকবে না? তুমি আমার মুখে পরকালে একটু জল দিতে পারবে না?

ভ। তা কেন পারবো না!

ন। তবেই তা হলেই আমার ঢের! পুষ্যি নেওয়ার দুর্ব্বুদ্ধি যেন আমায় ভগবান না দেন!

ভ। কেন বৌদি? মেয়ে মানুষ—নিঃসন্তান মেয়ে মানুষ হয়ে তুমি ওই কথা বল্লে!

ন। তুমি বুঝবে না, ভাই; তোমায় ঠেলে ফেলে পুষ্যিপুত্তুর দিয়ে আমার পরকাল রক্ষা করা চাইনি। না ও সব দুর্ম্মতি কর না—যেও না—

ভ। থেকে করবো কি? লোকের কাছে বেরুতে পরিচয় দিতে লজ্জা করে—

ন। নিজে পয়সা দিয়ে গতরে যা পার উপকার কর—

ভ। পয়সা?

ন। আচ্ছা তার জন্যে আটকাবে না—

সুস্থ ও প্রফুল্লমনে ভবানী বাহিরে গেল। ছুটী ফুরাইলে সে কলিকাতায় চলিয়া গেল। মাতৃসমা বৌদিদির কথাগুলি তাহার অবশ মনে এমনি করিয়া টনিকের কাজ করিত।

যাত্রী।

[সাহাদাৎ হোসেন।]

ছায়া-ঘেরা কুঞ্জের মাঝেতে
একেলাটী আনমনে সাঁঝেতে
উদাস নয়ন তুলে কি যেন স্বপন-ভুলে
চেয়ে আছি কনকিত সুদূরে;—
দিনের আলোক-তরী নীলিমার পরপারে
পাল তুলে চলে' যায় কোন্ মহা পারাবারে;
গম্ভীরে মধুরে—
ধরণীর ছবিখানি শোভিতেছে সুদূরে।
একেলা উদাস মনে বিজনে
বসে আছি সন্ধ্যার কাননে,
সমুখে তটিনী বাঁকা উরসে কিরণ মাখা
অস্ফুট কল্লোলে গাহিয়া,
বঙ্কিম বনপথে চলে মধু-নর্ত্তনে
সোণার সলিল বুকে খেলে মৃদু কম্পনে
শেষ গান গাহিয়া।
কিশোর গোপাল ধায় গোষ্ঠেতে নাচিয়া।
ঠুন্ ঠুন্ ঝঙ্কারি কাঁকণে
শেষ ঘট কাঁখে ধীর গমনে
চলে যায় কুলবালা গৃহপথ করি আলা
অঙ্গ-সুরভি খেলে পবনে,—
ঘাটের সোপান-পরে সিক্ত চরণরেখা
বঙ্কিম ঠামে আধ অঙ্কিত যায় দেখা;
মন্থর গমনে
শেষ ঘট লয়ে গেল তরুণী সে ভবনে।
সহসা দূরের গানে চমকি'
বিস্মিত আঁখি তুলি নিরখি—

সান্ধ্য-নদীর বুকে গান গেয়ে মনোসুখে
পাল-তোলা তরীখানি বাহিয়া
সুদূরের নেয়ে কেবা ধেয়ে আসে মোর পানে ;
অজানা সে কোন্ দেশে ঘর তার কেবা জানে।
বসে' আছি চাহিয়া—
দেখিতে দেখিতে তরী তীরে লাগে আসিয়া।
একি হেরি অপরূপ ! তরুণী
বেয়ে এল নদীবুকে তরণী !
মুখে তার হাসিমাখা নয়নে চাহনি বাঁকা,
গোপন মরম-কথা আভাসে
জানায়ে কহিল মোর চলিতে সুদূর দেশে
ভরা পালে তার সনে তরী বেয়ে ভেসে ভেসে
অনুকূল বাতাসে
কল্পনা-লীলাময় কুঞ্জের নিবাসে।
চেয়ে র'নু ভুঁলে গিয়ে সকলি
তরুণী নেয়ের মুখে কেবলি,—
করে ধরি তরী-পরে নিল সে উঠায়ে মোরে
বসা'ল সমুখে মোরে আদরে ;
ভাসিল আবার তরী সাঁঝের তটিনী-বুকে
ধরিল সে পুন তান মৃদু হাসি' মনোসুখে।
কম্পিত লহরে
উচ্ছলা রঙ্গিনী ধাইল সে সাগরে।
আজিও চলেছে ভেসে বিজনে
গান গেয়ে তরী বেয়ে দুজনে,
নাহি হেথা কোলাহল, অস্ফুট কলকল
শুধু জলকল্লোলে উঠিছে ;
দুপারে ধূসর বারি দূরে নীলবনরেখা
অঙ্কিত ছবি সম দূর পটে যায় দেখা।
তরঙ্গে নাচিছে
ছোট তরী, তরুণী সে তালে তালে গাহিছে।

নাহি জানি কতদিনে শেষ হবে গান গাওয়া,
বুঝি না ত কতদিনে কুঞ্জ সে যাবে পাওয়া ;—
তবুও চলেছি ভেসে নাবিকের মায়া-ঘোরে
বুঝি না এ নেয়ে মোরে বেঁধেছে কিসের ডোরে।

ফাল্গুনী ও বর্ত্তমান সমস্যা।

[শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ গুহ রায়।]

প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন এক একটা দিন আসে যে দিন হইতে তাহার ইতিহাস সম্পূর্ণ নূতন করিয়া আরম্ভ হয়। যে ভাবে, যে পথে তাহার জীবন পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতে ছিল, হঠাৎ একটা বিষম ধাক্কা খাইয়া প্রথমটা সমস্তই যেন ওলটপালট হইয়া যায়,—কোন কিছুরই পূর্ব্বাপর্য্য, পুরাতন গতানুগতিকের চির পরিচিত ধারাবাহিক পথ-ধারা আর ঠিক থাকে না ;—পথ যাহা ছিল, তাহার প্রতি মৃত্তিকা কণা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, ভাবধারা—যাহা ধরিয়া জাতীর জীবন অগ্রসর হইত তাহা ওতপ্রোত হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। সেই দিন হইতে সেই ইতস্ততঃ অতিবিক্ষিপ্ত বিশৃঙ্খলার স্তূপ হইতে কিছু কিছু উপাদান সংগৃহীত হইয়া আবার নূতন করিয়া চলিবার পথ ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইয়া থাকে—পুরাতন আদর্শের ভগ্নস্তূপ হইতে আবার নূতন আদর্শ গড়িয়া উঠিয়া মুগ্ধ বিমূঢ় জাতিকে হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া চলে।

প্রত্যেক জাতির জীবনেতিহাসেই এমন এক একটা যুগ আসে যখন তাহার সম্মুখ-দৃষ্টি অগ্রগমনের পথ হারাইয়া ফেলিয়া দৃষ্টিহীনের মত বিপথে চলে ; ভীত, ত্রস্ত চরণে কখনও একটু সম্মুখে হাঁটিয়া আবার ততোধিক বিহ্বল চরণে পিছনে সরিয়া আসে ; কখনও দক্ষিণে, কখনও বামে অতি সতর্কতায় পা বাড়াইয়া আবার সাথে সাথে একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় পুরাতনের গৃহদ্বারেই ফিরিয়া আসিতে চাহে। জাতির অন্তরাত্মা তখন যে পথ হইতে যাত্রা সুরু করিয়াছিল—সেখান হইতে যতদূর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে ততদূর পর্য্যন্ত স্থান কেবল হাতড়াইয়া বেড়ায় —একটু পা রাখিবার স্থান চাহে, স্বস্তির একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিবার জন্য

তাহার সমস্ত প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে। ইহাই যুগান্তরের প্রকাণ্ড লক্ষণ। নূতন পথ গড়িয়া তুলিবার জন্য যে প্রলয়ের আগমন তাহার বোধন এই জীর্ণ ইমারতের প্রতি ভগ্ন ইষ্টকের প্রাণের স্তরে স্তরে অমনি বাজিয়া উঠিতে আরম্ভ হয়।

জাতির জীবনের এই দিনটাই যুগসন্ধি কাল। জাতির ভাবিবার শক্তি তখন পঙ্গু হইয়া উঠিয়াছে, তাহার দৃষ্টি তখন ঝাপসা, প্রাণ অবসাদপূর্ণ। চিরদিন যাহারা অগ্রগমনের নান্দীপাঠ করে তাহাদের পা পর্য্যন্ত তখন কি একটা অনুপলব্ধ ভয়ে আর চলিতে চাহে না,—নানা যুক্তি তর্ক নামাইয়া তখন তাহারা জাতির আত্মাকে আরও দিশাহারা করিয়া তোলে। যে অন্ধ-বাউলের শুধু বাঁশী শুনিয়া শুনিয়া এতটা পথ তাহারা নির্ব্বিকারে, অতি আনন্দে চলিয়া আসিয়াছে সেই বিশ্বাসকে পর্য্যন্ত তাহারা আজ মানিতে চাহে না। যে নব-যৌবনের দল চিরবসন্তের অন্তরাত্মার সন্ধানে সারা পথ কেবল অর্থহীন গানে গানে, পাগল সাগর-নীরের ক্ষ্যাপা তালে তালে নাচিয়া চলিয়াছে তাহারা পর্য্যন্ত এই সন্ধিক্ষণে অতল কালো গুহা-মুখে দাঁড়াইয়া আর অগ্রসর হইতে চাহে না। তরুণ সূর্য্যের প্রভাতী আলো আর পূর্ণিমায় ভরা-চন্দ্রের কুহেলিভরা জ্যোৎস্না যাহাদের পথ ম্লানোজ্জল করিয়া রাখিয়াছিল আজ তাহারা সূর্য্য ও চন্দ্রের তিরোভাবে ভীতিবিহ্বল হইয়া উঠে।" সমস্তদিন ধূলা আর ছায়ার পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান্ হইয়া "জাতির আত্মা—এই নবজীবনের দল তখন মনে করে যে বড় ভুল হইয়া গিয়াছে। চলিবার পথে, যতদিন পর্য্যন্ত অগ্রগমনের পথ পরিষ্কার ছিল ততদিন পর্য্যন্ত কখনও মনে হয় নাই "ভুল হইয়া গিয়াছে বা ঠকিয়াছি, কিন্তু যত বাধা, যত সংশয় এখনই মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। মনে হয় বৃদ্ধ "শ্রুতিভূষণ"ই ঠিক কহিত, "দাদার" কাঠখোট্টা চৌপদী গুলোর উপরই শ্রদ্ধা বাড়িতে আরম্ভ করে।

প্রত্যেক সমাজেই এই "শ্রুতিভূষণ" ও "দাদা" আছে। ইহারা হাস্য রসকে জীবন হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারিলে বাঁচেন, কোন কিছু আশা করাকে ইহারা মহাপাপ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহাদের "উপদেশের এক ফুৎ-কারেই আশা-প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।" যে স্পর্শে পৃথিবীর ধূলা মাটি পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠে সেই বসন্তের আমেজও ইহাদের গায়ে লাগে না। ইহারাও চলেন বটে তবে চলিবার টানের সময়ও পেছন দিকে ঝুঁকি রাখেন, যতটা বেগ কমান যায়!

জাতির জীবনে ইহাদেরও প্রয়োজন আছে সত্য কিন্তু যুগসন্ধিক্ষণে ইহারা প্রয়োজন অপেক্ষা অপ্রয়োজনের পক্ষপাতিত্বই বেশী করিয়া থাকেন। যে নবযৌবনের দল এতদিন একটা বাধাবন্ধহীন অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে তাহারাই আজ হতাশ হইয়া উঠে। অলক্ষিত অদৃষ্টের বিদ্রূপহাস্য তখনই দিঙমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে যখন তাহারা পেছন ফিরিয়া এতদিন যে চৌপদী-ভক্ত দাদাকে কেবল ঠাট্টাই করিয়া আসিয়াছে তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহে। এই যে অগ্রগমনের দল, এই যে সীমাহারা পথের চিরানন্দ পথিককুল যাহাদের পথচলার আনন্দে সমগ্র বিশ্ব পুলকিত হইয়া উঠে তাহারাই যখন ফিরিতে চাহে, যে পথ দিয়া নির্ভয় আনন্দে তাহারা গান গাহিয়া আসিয়াছে সে পথেই হতাশাখিন্ন মুখে যখন তাহারা ফিরিতে চাহে, তখনই বুঝিতে হইবে জাতির আসন্ন মৃত্যু সম্মুখীন। যে জাতি সৌভাগ্যবান্ সে বাঁচিয়া যায়, যে নয় সে মরে।

আজ আমরা যে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, সে স্থানের সে যুগের সম্বন্ধে কি এই সমস্তই খাটে না? যাঁহারা 'অনাবশ্যককেই জীবনে বরণ করিবার আবশ্যকতা এতদিন বুঝাইয়া আসিতে ছিলেন তাঁহারা কি একটা উল্টা সুরে গান ফিরিয়া গাহিবার চেষ্টা করিতেছেন না, জীবনের প্রতি উৎসমুখই কি দৈহিক ও সাংসারিক নিকট প্রয়োজনের জন্য নিয়োজিত করিতে হইবে? সত্য সত্যই কি—

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে।
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্ববাঝে
যে হেতু সে লাগে বিশ্বকাজে॥

কবিতায় ও ছন্দে অনাবশ্যকের বন্দনা-গীতি যখনই বাজিয়া উঠিয়াছে তখনই দেখিয়াছি কত নবীনের উপাসক ছুটিয়া আসিয়াছে তাহাকে জীবন ও কার্য্যে বরণ করিয়া লইতে; কিন্তু আজ অনাবশ্যক যখন সত্য সত্যই বস্তুগত্যা মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমাদের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন এই চির-তরুণ নূতনকে দেহ মনে বরণ করিয়া লইবার মত হৃদয়ের বিরলতা দেখি কেন? বিধাতার ঝঞ্ঝাকে যাহারা কবিতায় আরাধনা করিয়াছে আজ সে ঝঞ্ঝা যখন তাহার পূর্ণ রুদ্র মধুর বেশে নামিয়া আসিয়াছে তখন তাহারা গৃহকোণে লুকায়িত কেন? ইহাই সমস্যা।

এই সমস্যাই নবযৌবনের দলকে এক অশুভ সন্ধ্যায় ব্যাকুল করিয়া

তুলিয়াছিল। যে অতি বিবেচকের ভীত পরামর্শে চিরদিন অবহেলা দেখাইয়া তাহারা এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল, সেই অতি বিবেচক "দাদা"কেই সে সন্ধ্যায় তাহারা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে করিতে চাহিতেছিল। এতদিন তাহারা আদ্যিকালের বুড়োকে চাহিয়াছিল বটে কিন্তু নিজেদের প্রাণে প্রাণে সেই "বুড়োর প্রকৃত স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই; তাই আজ অতি নিকটে আসিয়াও, লক্ষ্য একরূপ হাতের মুঠায় পাইয়াও তাহাদের মন দ্বিধা কম্পিত। এক একবার তাই তাহারা সব ফেলিয়া আবার পুরাতন পথে ফিরিবার মন করিতেছিল।

একই সমস্যা আজ আমাদিগকে বিহ্বল করিতেছে। এতদিন আমরা যাহা চাই বলিয়া লাফালাফি করিতেছিলাম, গান সুরু করিয়া দিয়াছিলাম, আজ তাহারি গৃহ-কোণে আসিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট ভয় আমাদের প্রাণ অভিভূত করিতেছে; আজ মনের গোপন অন্তঃপুরে বলিতেছি "কাজ নাই ভাই ফ্যাসাদে —বেশ ছিলাম কিন্তু দুই বৎসর আগে'—যদিও বাহিরে বলি এ পথ ঠিক নয়, পাশ দিয়া ঠিক রাস্তা গিয়াছে। আজ আমরা যুক্তিতর্ক, বাধাবন্ধের-সূক্ষ্ম আলোচনায় বসিয়া গিয়াছি যদিও এতদিন এই তার্কিককে বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করিতে মোটেই কুণ্ঠিত হই নাই। আজ আমরা কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহিতেছি না। কোনরূপ ফল প্রাপ্তির উপর আমরা বিশ্বাসী নই। যাহাদের অতিবিবেচক বলিয়া তিরস্কার করিয়া আসিয়াছি তাহাদেরি তর্কধারা আপন করিয়া লইয়া আজ আমরা মধ্যপন্থী হইতে চাহিতেছি—যাহারা পিছনে আছে আর যাহারা সম্মুখে আছে উভয়কেই তাহা হইলে বিদ্রূপ করিতে পারিব।

আজ ভুলিয়া যাইতেছি জাতির জীবনেতিহাসের কথা। আজ মনে রাখিতে হইবে সকল তর্ক, সকল যুক্তিবাদ সব ছাড়াইয়া অনেক উচ্চে বিশ্বাসের স্থান। মনে রাখিতে হইবে এই সব যুগ-সন্ধিক্ষণে কোন যুক্তিবাদ কোন তর্ক ছল জাতিকে অগ্রসর করাইতে পারিবে না।—একমাত্র সিদ্ধির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসই দৃষ্টিহীন বাউলের মত এই নবযৌবনের দল, তথা সমগ্রজাতিকে নূতন পথে নূতন আলোতে লইয়া যাইবে—তাহারই বাঁশীর সুরে সুরে গানের পরতে পরতে যে আদর্শ লুক্কায়িত আছে তাহাই জাতির দৃষ্টির সম্মুখে ভবিষ্যৎ আদর্শ বলিয়া প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। এইরূপ সন্ধিক্ষণে সকল যুক্তির উপরে সিদ্ধির প্রতি অবিচলিত বিশ্বাসের স্থান, তাই নবযৌবনের দলকে যে

ভীষণ সমস্যা হইতে উদ্ধার করিয়া পথ প্রদর্শক হইয়াছিল সে অন্ধ সে বাউল। সে শুধু গাহিয়াছিল—এস, এস, এস আমি পথ দেখাইব। সে কহিয়াছিল— এস, এস, এস, আমি পথ দেখাইব। সে কহিয়াছিল "আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এস। গান না গাইলে আমি রাস্তা পাইনে। আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়—সে এগিয়ে চলে আমি পিছনে চলি।"

আজ কি আমরা একটা সমস্যায় পড়ি নাই? যে ভাব আমাদের মজ্জায় মজ্জায় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল তাহাকে আজ আমরা ছাড়িবার জন্য অতি ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের-দৃষ্টি আজ ঝাপ্‌সা হইয়া উঠিয়াছে, আমাদের ভাবিবার শক্তি ত পঙ্গু। আজ কেহ আমরা পিছনে যাইতে চাহি, কেহ সম্মুখে, কেহ কোথায়ও না, কেহ পাশে। আজ এমন অবস্থায় আমরা বিধাতার বিদ্যুৎকে, বজ্রকে, দুর্য্যোগের রক্তচক্ষুকে ভয় করিলে যে আর চলিতেই পারিব না। আজ রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য আশ্বাস বাণী স্মরণ করিয়া আমরা যেন পথ চলি—

"বাধার সম্ভাবনা জানিয়াই চলিতে হইবে, দুঃখকে স্বীকার করিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, অতি-বিবেচকের ভীত পরামর্শে নিজেকে দুর্ব্বল করিয়ো না। যখন বিধাতার ঝড় আসে, বন্যা আসে তখন সংযতবেশে আসে না, কিন্তু প্রয়োজন বলিয়াই আসে, তাহা ভালোমন্দ, লাভক্ষতি দুইই লইয়া আসে। যখন বৃহৎ উদ্যোগে সমস্ত দেশের চিত্ত বহুকাল নিরুদ্যমের পর প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তখন সে নিতান্ত শান্তভাবে, বিজ্ঞভাবে, বিবেচকভাবে, বিনীতভাবে প্রবৃত্ত হয় না। শক্তির প্রথম জাগরণে মত্ততা থাকেই—তাহার বেগ, তাহার দুঃখ, তাহার ক্ষতি, আমাদের সকলকেই সহ্য করিতে হইবে—সেই সমুদ্র-মন্থনের বিষ ও অমৃত উভয়কেই আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।"

আজ তাই এই যে ছেলের দল স্কুল কালেজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে ইহাতে অনর্থপাতের সম্ভাবনা থাকিলেও বিচলিত হইবার কোন কারণই নাই। আমাদের গতানুগতিক ভাবধারার সহিত ইহার সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই ইহাদের বাধা দেওয়া অন্যায়। সমাজের প্রত্যেক অংশই যে ইহাদের পথানুসরণ সাথে সাথেই করিবে ইহা ভাবাও অনুচিত। নবযৌবনের দল যখন ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল তখনও খেয়াঘাটের মাঝি তাহার চিরন্তনীহাল ফেলিয়া তাহাদের সাথে রওনা হয় নাই বা কোটাল মহাশয়ও তাহার চৌকিদারি ছাড়িয়া ইহাদের দলে ভিড়েন নাই।

"ফাল্গুনী" এই হিসাবে বিশ্বসভ্যতা ইতিহাসের কাব্যমূর্ত্তি। যুগে যুগে মানুষের জীবনে, প্রত্যেক জাতির অন্তরাত্মাতে এই নাট্য গীত হইয়াছে—ইহাই যুগ যুগ ধরিয়া গীত হইবে। সমগ্র নবযৌবনের দল এই যে পুরাতনের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কাণে কাণে, প্রাণে প্রাণে অন্ধ বাউলের সেই প্রাণ সাধনার সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক—

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ীরে আনন্দ গান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক্,
আশার অরুণা লোক
হোক অভ্যুদয় রে॥

উন্মাদিনী রাই

[শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বাছুরি দোখলে অমনি ছুটিয়া
কোলে সে লইছে তুলি'
নিজেরে যেন সে বঁধুয়া ভাবিছে
কেবলি আপনা ভুলি'!
গলিত কদম খুঁটিয়া খুঁটিয়া
খোঁপায় গুঁজে সে তাই,
কদমে লাগিয়া সে' চরণ রেণু—
ভাবিয়া আকুল রাই

পিয়ালের শাখে পিক যদি ডাকে—
সেথায় তাহার কাণ,
মনে বুঝি হয়— বঁধুর বাঁশরী
এমনি করিছে ভাণ!
যমুনা সলিলে নাহিতে নামিলে
উঠিতে সে নাহি চায়,
বঁধুর দেহের পরশ টুকুন
মাখা আছে যমুনায়!
চাঁপার বরণ আজিকে এমন
হ'য়েছে গো কালো ঝুল!—
সেই রূপে আজ বঁধুরে নেহারি
রাধা হ'ল মশগুল!

নির্ব্বাসিতের আত্মকথা।

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যে রাত্রে জেলে গিয়া পৌছিলাম, সে রাত্রে আর ভালমন্দ কিছু ভাবিবার অবস্থা আমাদের ছিল না। ধরা পড়িবার পর বারীন্দ্র বলিয়াছিল—My mission is over—আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে!—কিন্তু সে কথার প্রতিধ্বনি ত নিজের মধ্যে একটুও খুঁজিয়া পাইলাম না। দেশের কাজ ত সবই বাকি!—শুধু আমাদের কাজই ফুরাইয়া গেল! প্রাণভরা সহস্র আকাঙ্ক্ষা, কত কি বিচিত্র কল্পনা লইয়া যুগান্তর গড়িতে নামিয়াছিলাম—এক ভূমিকম্পে সবটাই ধুলিসাৎ হইয়া গেল। এ জগতে শুধু পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ীটাই সত্য, আর বাকি সবটাই মায়া? অতীতের কত স্মৃতি তুবড়ী বাজীর মত মাথায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। মনে পড়িল তিন চার মাস দেশময় টো টো করিয়া ঘুরিয়া যখন শীর্ণ ক্লান্ত দেহভার লইয়া একদিন বাড়ীতে ফিরিয়াছিলাম

তখন মা আমার মুখের দিকে চাহিয়া অভিমান ভরে বলিয়াছিলেন—"ছেলের আর আমার মায়ের রান্না ভাত ভাল লাগে না! কোথায় দীন দুঃখীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়াস্, বাবা। 'ভদ্দর নোকের' ছেলে; শেষে কি কোন দিন পুলিসে ধরে 'অপমান্যি' করবে!"—আজ সত্য সত্যই পুলিসে ধরিয়া 'অপমান্যি' করিল। আবার মনে পড়িল সেই পাহারাওয়ালার কথা যে আসিতে আসিতে বলিয়াছিল—"বাবুজী তোমরা যদি একটা কিছু গোলাগুলি ছুঁড়তে, তাহলে আমরা সবাই পালিয়ে যেতুম।" তাইত! চুপ চাপ একেবারে ভেড়ার দলের মত ধরা পড়িলাম। এ দুঃখ যে মরিলেও ঘুচিবে না! একজন পুলিস সার্জেণ্ট ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল—"এরা এমনি সুবোধ ছেলে যে বাগানে ঘুমাইবার সময় রাস্তায় একজন পাহারা পর্য্যন্ত রাখে নাই।" কথাটা সারারাত মাথার ভিতর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু এখন আর হাত কামড়ান ছাড়া উপায় নাই। একবার উল্লাসের উপর রাগ ধরিল। পুলিসের দল যখন প্রথম বাগানে আসিয়া ঢুকে, তখন সে জাগিয়া উঠিয়াছিল; ইচ্ছা করিলে সে পলাইতেও পারিত। কিন্তু নির্ব্বিকার সাক্ষীস্বরূপ ব্রহ্ম পুরুষের ন্যায় সে ব্যাপারটা চুপ চাপ বসিয়া দেখিয়াছিল মাত্র; পলাইবার কথা তাহার মনে আসে নাই!

সে রাতটা এই রকম দুশ্চিন্তায় কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া কুঠরীর (cell) বাহিরে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—নরক একেবারে গুলজার। আমাদের সব আড্ডাগুলির ছেলেরাই আসিয়া জুটিয়াছে। অধিকন্তু পাঁচ সাতজন অপরিচিত ছেলেও দেখিলাম। ইহারা আবার কোথাকার আমদানি? একটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাপু হে, তুমি কে বট?"

ছেলেটী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"আজ্ঞে আমার বাড়ী মানিকতলায়। আপনাদের বাগানের কাছে সকালবেলা একটু মর্ণিং ওয়াক করতে গিছলাম; তাই—রা আমায় ধরে এনেছে। মর্ণিং ওয়াক করাটা যে এত বড় মহাপাপ তা'ত জানতুম না।"

দেখিলাম নগেন সেন গুপ্ত আর তার ভাই ধরনীকেও পুলিস জেলে পুরিয়াছে। বেচারারা বোমার 'ব' পর্য্যন্ত জানে না। পুলিসে বোমার আড্ডার সন্ধান পাইয়াছে ভাবিয়া উল্লাসকর বোমাগুলি কোথায় সরাইয়া রাখিবে স্থির করিতে না পারিয়া বাল্যবন্ধু নগেনের বাড়ীতে একটা বোমার প্যাটরা রাখিয়া আসিয়াছিল। প্যাটরার ভিতর

যে সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে, নগেন বা ধরণী তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিত না। তাহাদের বাঁচাইবার জন্যই উল্লাস পুলীসের নিকট সব কথা স্বীকার করিল। উল্লাসের বিশ্বাস ছিল যে সত্য কথা জানিতে পারিলেই পুলীসের কর্ত্তারা নগেন ও ধরণীর উপর আর মোকর্দ্দমা চালাইবে না। পুলীস যে ঠিক ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের বংশ-সম্ভূত নয় এ কথাটা তখন ত আমাদের মাথায় ভাল করিয়া ঢুকে নাই।

ক্রমে পুলিস নানা জেলা হইতে অনেকগুলি ছেলে আনিয়া হাজির করিল। শ্রীহট্ট হইতে সুশীল সেন ও তাহার দুই ভাই বীরেন ও হেমচন্দ্র আসিল। সুশীলকে আমরা পূর্ব্বে চিনিতাম কিন্তু তাহার দুই ভাইকে ইহার পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। মালদহ হইতে কৃষ্ণজীবন যশোহর হইতে বীরেন ঘোষ ও খুলনা হইতে সুধীরও আসিয়া পৌঁছিল।

আর আসিয়া পৌঁছিলেন আমার পুরাতন বন্ধু পণ্ডিত হৃষীকেশ। হৃষীকেশ আমার ডফ কলেজের সহপাঠী। কলেজ হইতে মা ইংরাজী সরস্বতীকে বয়কট করিয়া আমি যখন সাধুগিরি করিতে বাহির হই, তখন পণ্ডিত হৃষীকেশ ভাবাধিক্য বশতঃ নিমতলার ঘাটের গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে সমস্ত সৎকর্ম্মে সে আমার সহগামী হইবে। একে নিমতলার ঘাট—মহাতীর্থ বলিলেই হয়; তাহার উপর মা গঙ্গা—একেবারে জাগ্রত দেবতা। সেখানকার প্রতিজ্ঞা কি আর বিফল হইবার জো আছে? মা গঙ্গা কি কুক্ষণেই তাহার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া মনে মনে 'তথাস্তু' বলিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু সেইদিন হইতে আজ অবধি পণ্ডিত হৃষীকেশ আমার পিছনেই লাগিয়া আছে। শাস্ত্রে বলে যে উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে ও শ্মশানে, যে একসঙ্গে গিয়া দাঁড়ায়, সেই বান্ধব। হৃষীকেশের বিবাহে ও তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশনে আমি লুচি খাইয়া আসিয়াছি, দুর্ভিক্ষের সময় দুজনে পীড়িতের সেবা করিয়াছি; এক সঙ্গে উভয়ে সাধুগিরি করিয়া ফিরিয়াছি, মাষ্টারীও করিয়াছি আজ রাষ্ট্র বিপ্লব করিতে গিয়া একসঙ্গে উভয়ে পুলিসের হাতে ধরাও পড়িলাম। ভবিষ্যতে যে উভয়কে একসঙ্গে শ্রীধাম আন্দামান বাস করিতে হইবে, তাহা তখন জানিতাম না। বান্ধবত্বের সব লক্ষণই মিলিয়াছে; বাকি আছে শুধু শ্মশানটুকু। নিমতলার ব্রতটুকু এখন নিমতলায় উদ্‌যাপন করিয়া আসিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হই।

যাক, সে ভবিষ্যতের কথা। জেলে গিয়া দুই দিন বিশ্রাম করিতে না

করিতেই দেখি পণ্ডিত হৃষীকেশ বিশাল দেহভার দোলাইতে দোলাইতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। তাহার সহিত মাণিকতলার বাগানের কোনও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না; আমাদের কার্য্যকলাপের কিছু কিছু সে জানিত মাত্র। তাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণও ছিল না। বাগানের কাগজ পত্রের মধ্যে দু এক জায়গায় তাহার নাম পাইয়া পুলীস সন্দেহ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ছিল। কিন্তু গঙ্গাজল ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা ত আর বিফল হইবার নয়; তাহাকে যে আন্দামানে যাইতেই হইবে। পুলীস যখন তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া গিয়া হাজির করে তখন তাহার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত গোলগাল নাদুসনুদুস চেহারা দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটেরও তাহাকে নিরপরাধ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখ দেখিয়াই বন্ধুর আমার মেজাজটা একেবারে বিগড়াইয়া গেল। মহামান্য সরকার বাহাদুরের রাজ্য ও শাসন নীতি সম্বন্ধে বন্ধু আমার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আর এখানে পুনরুদ্ধৃত করিয়া এ বৃদ্ধ বয়সে বিপদে পড়িবার আমার ইচ্ছা নাই। পূর্ব্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহেবের টম-ফুলারির (tom-foolery) আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া লাট মর্‌লীর পিতৃ-শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে সবই ছিল। পণ্ডিতজীর বক্তৃতা শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জেলের মধ্যে এক স্বতন্ত্র কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার রাজনৈতিক মতামতের সংস্কার করিতে আদেশ দিলেন।

সপ্তাহের মধ্যে আসিয়া হাজির হইলেন শ্রীমান দেবব্রত। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে তিনি যুগান্তরের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নবশক্তির সম্পাদকের কাজ করিতেছিলেন। 'নবশক্তি' উঠিয়া যাওয়ার পর আপনার সাধন ভজন লইয়াই বাড়ীতে বসিয়া থাকিতেন। বাহিরের লোকের সহিত বড় একটা দেখাশুনা করিতেন না। চলমান পর্ব্বতবৎ তিনিও একদিন সুপ্রভাতে আসিয়া হাজির হইলেন।

পুলীস কোর্টে শুনিয়াছিলাম যে আমরা যে দিন ধরা পড়ি সে দিন অরবিন্দ বাবুকেও ধরা হইয়াছিল। কিন্তু আমরা জেলের যে অংশে আবদ্ধ ছিলাম সেখানে তাঁহার দেখা পাইলাম না। শুনিলাম তাঁহাকে অন্যত্র আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

হৃষীকেশকে যে দিন পুলিস ধরিয়া আনে তাহার দুই এক দিন আগে শ্রীরামপুর হইতে গোস্বামীদের বাড়ীর নরেন্দ্রকেও ধরিয়া আনিয়া ছিল। সে আমাদের সহিত এক জায়গায় আবদ্ধ ছিল।

আমাদের বাগানে একখানা নোটবুকে একটা নাম লেখা ছিল—চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী। খুলনার ইন্দুভূষণকে আমরা চারু বলিয়া ডাকিতাম। পুলিস তাহা না জানিয়া চারুচন্দ্র রায় চৌধুরীকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে স্থির করিল যে চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ই ঐ চারুচন্দ্র রায় চৌধুরী। চারুবাবুর বোধ হয় অপরাধ যে কানাইলাল দত্ত ও আমি উভয়েই তাঁহার ছাত্র ও উভয়েরই বাড়ী চন্দননগর। যাঁহার ছাত্রেরা এমন রাজদ্রোহী, তিনি 'রায়'ই হোন, আর 'রায় চৌধুরী'ই তাহাতে কি আসিয়া যায়? তাঁহাকে ত ধরিতেই হইবে!

যাক সে কথা। অল্পদিনের মধ্যেই এক এক করিয়া পুলিস প্রায় ৩০।৩৫ জন লোককে হাজতে টানিয়া আনিল। তিন চারটা কুঠরীতে তিন তিন জন করিয়া রাখিল; বাকি সকলের জন্য পৃথক পৃথক কুঠরীর ব্যবস্থা হইল।

ধরাপড়ার উত্তেজনা সাম্‌লাইতেই প্রায় সপ্তাহ কাটিয়া গেল। প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলাম একটী প্রায় সাত হাত লম্বা ৫ হাত চওড়া কুঠরীর মধ্যে আমরা তিনটী প্রাণী আবদ্ধ আছি। আমি ছাড়া দুইটীই ছেলে মানুষ; একটীর বয়স বছর কুড়ি আর একটীর বয়স পনের। প্রথমটী নলিনী কান্ত গুপ্ত—প্রেসিডেন্সী কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, নিতান্ত সাত্ত্বিক প্রকৃতির ভাল ছেলে; আর দ্বিতীয়টী শচীন্দ্র নাথ সেন—ন্যাশন্যাল কলেজের পলাতক ছাত্র—একেবারে শিশু বা বাচ্ছা বলিলেই হয়। সেই কুটরীর এক কোণে শৌচ প্রস্রাবের জন্য দুইটী গামলা। তিন জনকেই সেইখানে কাজ সারিতে হয়; সুতরাং একজনকে ঐ অবশ্য কর্ত্তব্য অশ্লীল কর্ম্মটুকু করিতে গেলে আর দুই জনের চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। কুঠরীর সামনে একটী ছোট বারান্দা, সেইখানে হাত মুখ ধুইবার ও স্নানাহার করিবার ব্যবস্থা। বারান্দার সামনে সরু লম্বা উঠান আর তাহার পরেই অভ্রভেদী প্রাচীর। প্রাচীরটা ছিল আমাদের চক্ষুশূল। সেটা যেন অহরহঃ চিৎকার করিয়া বলিত,—"তোমরা কয়েদী, তোমরা কয়েদী। আমার হাতে যখন পড়িয়াছ, তখন আর তোমাদের নিস্তার নাই।"

প্রাচীরের উপর দিয়া খানিকটা আকাশ ও একটা অশথ গাছের মাথা দেখিতে পাওয়া যাইত। জেলখানার কবিত্ব কেবল ঐটুকু লইয়াই, বাকি সবটাই একেবারে নিরেট গদ্য। আর সব চেয়ে কটমট গদ্য আহারের ব্যবস্থাটা।

প্রথম দিন তাহা দেখিয়া হাসি পাইল, দ্বিতীয় দিন রাগ ধরিল, তৃতীয় দিন কান্না আসিল। সকাল বেলা উঠিতে না উঠিতেই একটা প্রকাণ্ড কালো জোয়ান বাল্‌তি হইতে সাদা সাদা কি খানিকটা আমাদের লোহার থালের উপর ঢালিয়া দিয়া গেল। শুনিলাম উহাই আমাদের বাল্যভোগ এবং আলীপুরী ভাষায় উহার নাম 'লপ্‌সী'। 'লপ্‌সী' কিরে বাবা! শচীন দূর হইতে খানিকটা পরীক্ষা করিয়া বলিল—'ওহো! এ যে ফেন মিশান ভাত।'—পরদিন দেখিলাম দালের সহিত মিশিয়া লপ্‌সী পীতবর্ণ ধরিয়াছে; তৃতীয় দিন দেখিলাম উহা রক্তবর্ণ। শুনিলাম উহাতে গুড় দেওয়া হইয়াছে এবং উহাই আমাদের প্রাতরাশের রাজকীয় সংস্করণ। সাড়ে দশটার সময় একটা টিনের বাটীর এক বাটী রেঙ্গুন চালের ভাত, খানিকটা অরহর ডাল, কি খানিকটা পাতা ও ডাঁটা সিদ্ধ ও একটু তেঁতুল গোলা। সন্ধ্যার সময় ও তদ্বৎ, কেবল তেঁতুল গোলাটুকু নাই।

ডাক্তার সাহেব ও জেলার বাবু আমাদের সহিত দেখা করিতে আসিবা মাত্র আমরা একটা প্রকাণ্ড উদর-নৈতিক আন্দোলন সুরু করিয়া দিলাম। ডাক্তার সাহেব জাতিতে আইরিস, নিতান্তই ভদ্রলোক। আমাদের সব কথাগুলি চুপ করিয়া শুনিয়া বলিলেন—"উপায় নাই। জেলের কয়েদীর খোরাক একেবারে দরকারের হিসাব মত বাঁধা। কাহারও অসুখ বিসুখ হইলে তিনি হাঁস-পাতাল হইতে পৃথক বন্দোবস্ত করিতে পারেন; কিন্তু সুস্থ অবস্থায় অন্য আহার দিবার তাঁহার অধিকার নাই।" জেলার বাবু বলিলেন,—"জেলের বাগানে আলু, বেগুণ, কুমড়া, পেঁয়াজ প্রভৃতি সব তরকারীই ত হয়, জেলের খোরাক ত মন্দ নয়।" শচীন নিতান্ত ঠোঁটকাটা ছেলে; সে বলিল—"বাগানে ত হয় সবই, কিন্তু পুঁই ডাঁটা আর এঁচোড়ের খোসা ছাড়া বাকি সবগুলা বোধ হয় রাস্তা ভুলিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।"

দেখিলাম অসুখ করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। কাজেই আমাদের সকলকার অসুখ করিতে লাগিল। নিত্য নিত্য নূতন অসুখ কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া যায়? পেট কামড়ান, মাথা ধরা বুক দুড় দুড় করা, গা বমি বমি করা সবই যখন একে একে ফুরাইয়া আসিল তখন বাহিরে প্রকাশ পায় না এমন অসুখ আবিষ্কারের জন্য আমাদের মাথা ঘামিয়া উঠিল। রোগ ত একটা কিছু চাই—তা না হইলে প্রাণ যে বাঁচে না। ডাক্তার

সাহেব আসিলে পণ্ডিত হৃষীকেশ গম্ভীর ভাবে জানাইলেন যে তাঁহার বামচক্ষুর উপরের পাতা তিন দিন ধরিয়া নাচিতেছে, সুতরাং তিনি যে কঠিন পীড়াগ্রস্ত সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার মনে হইতেছে যে হাঁসপাতালের অন্ন ভিন্ন তাঁহার বাঁচিবার আর উপায় নাই। ডাক্তার বেচারা হাসিয়া তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন।

হঠাৎ আমরা আরও একটা অবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। সেটা এই যে পয়সা থাকিলে জেলখানার মধ্যে বসিয়া সবই পাওয়া যায়। জেলের প্রহরী ও পাচকের হাতে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিতে পারিলেই ভাতের ভিতর হইতে কৈ মাছ ভাজা ও রুটির গাদার ভিতর হইতে আলু পেঁয়াজের তরকারী বাহির হইয়া আসে, এমনি কি পাহারাওয়ালার পাগড়ীর ভিতর হইতে পান ও চুরুট বাহির হইতে দেখা গিয়াছে।

একটা মহা অসুবিধা ছিল এই যে এক কুঠরীর লোকের সহিত অপর কুঠরীর লোকের কথা কহিবার হুকুম ছিল না। প্রথমে লুকাইয়া লুকাইয়া এক আধটা কথা কওয়া হইত; তাহাতে পাহারাওয়ালাদের ঘোরতর আপত্তি। তাহারা জেলারের কাছে রিপোর্ট করিবার ভয় দেখাইতে লাগিল হঠাৎ কিন্তু এক দিন দেখা গেল তাহারা শান্ত শিষ্ট হইয়া গিয়াছে; আমরা চীৎকার করিয়া কথা কহিলেও আর তাহারা শুনিতে পাইত না। অনুসন্ধানে জানা গেল আমাদের একজন বন্ধু রৌপ্য খণ্ড দিয়া তাহাদের কাণের ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। জেলার বা সুপারিন্‌টেনডেণ্ট আসিবার সময় তাহারাই আমাদের সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল। রৌপ্য খণ্ডের যে অনন্ত মহিমা তাহা এত দিন কাণেই শুনিয়াছিলাম তাহার এইবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়া মানব জন্ম সফল হইল। কিন্তু একটা দুঃখ কতকটা ঘুচিতে না ঘুচিতে আর এক দুঃখ দেখা দিল।

আমরা জেলে আসিবার পর হইতেই জেলের মধ্যে সি, আই ডির কর্ত্তাদিগের শুভাগমন আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিলে মনে হইত যেন আমাদের বীরত্বের গৌরবে তাঁহাদের বুকখানা ফুলিয়া দশ হাত হইয়াছে, আমাদের সহিত সহানুভূতিতে প্রাণ যেন তাঁহাদের ফাট ফাট। কথাগুলি তাঁহাদের এমনি মোলায়েম হাব ভাব এমনি চিত্তবিমোহন যে দেখিলে শুনিলেই মনে হইত ইহারা আমাদের পূর্ব্ব জন্মের পরমাত্মীয়। তবে ধরা পড়িবার পরদিন তাঁহাদের ঘরে একরাত্রি বাস করিয়া এসব ছলাকলার পরিচয়

অনেক পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম - তাই রক্ষা। ইহারা সপ্তাহ খানেক যাতায়াতের পর নরেন্দ্র গোস্বামী যেন হঠাৎ একটু বেশী অনুসন্ধিৎসু হইয়া দাঁড়াইল। বাংলা ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও বিপ্লবের কেন্দ্র আছে কি না, আর থাকিলে সেখানকার নেতাদের নাম কি—ইত্যাদি অনেক রকম প্রশ্নই সে আমাদের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। জেলের কর্ত্তৃপক্ষের এক আধ জনের কথাবার্ত্তায়ও বুঝিলাম—একটা গোলমাল কোথাও লাগিয়াছে।

হৃষীকেশ একদিন আসিয়া আমায় বলিল—"গোটা দুই তিন বেয়াড়া রকমের মাদ্রাজী বা বর্গির টর্গির নাম বানিয়ে দিতে পারিস্?"

"কেন?"

"নরেন বোধ হয় পুলিসকে খপর দিচ্ছে; গোটা কত উদ্ভট রকমের নাম বানিয়ে দিতে পারলে—স্যাঙ্গাতরা দেশময় অশ্বডিম্ব খুঁজে খুঁজে বেড়াবে খ'ন।" তাহাই হইল। মহারাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের সভাপতি হইলেন শ্রীমান পুরুষোত্তম নাটেকার, গুজরাতের সভাপতি হইলেন কিষণজী ভাওজী রা এই রকম একজন কেহ কিন্তু মাদ্রাজের ভার লইবেন কে? মাদ্রাজী নাম যে তৈয়ারী করা শক্ত। খবরের কাগজে তখন চিদম্বরম্ পিলের নাম দেখা গিয়াছিল। হৃষীকেশ বলিল যখন চিদম্বরম্ মাদ্রাজী নাম হইতে পারে তখন বিশ্বম্ভরম্ কি দোষ করিল? আর পিলের বদলে যকৃৎ বা অমনি একটা কিছু পুরিয়া দিলে চলিবে।

নারায়ণের পঞ্চপ্রদীপ।

সহজিয়া

[শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি-এল্]

হে অপরিচিত, হে রহস্যময়, এই যাকে তুমি দিয়ে গিয়েছ এও কি চিরদিন তোমারই মত চিরমৌন থেকে যাবে? তুমি সেই যে দু'দিনের জন্য দেখা দিয়ে কোথায় কোন্ গোপনতার মধ্যে আপনাকে লুকালে আজও সেই গোপনতার অবসান হল না। আর এই যাকে তোমার চির স্মৃতিরূপে রেখে গেলে, এও যে চিরদিনের মত মূক বধির এবং হৃতবুদ্ধি হয়ে চিরসুদূর দেবতার

পাষাণ প্রতিমার মত হয়ে রৈল! একে নিয়ে আর কত দিন কাটাব? কত আর পাষাণের এই মূক প্রতিকের সেবা করে এর অধিষ্ঠাতৃদেবতার পুনরাবির্ভাবের আশায় থাকব? কতদিন—ওগো কতদিন? দিনের পর দিন গেছে মাসের পর মাস গেছে বৎসরের পর কত বৎসর চলে গেছে, তবু তুমি দূরে—অতি দূরেই রয়ে গিয়েছো! আর যে কাটে না দিন—আর যে পারি না প্রভু!

যাক্, না পারলেও পারতে হবে কারণ তাই তাঁর ইচ্ছা যে!

কত দিন হয়ে গেছে তবু সে দিনকার একটা কথাও ত' ভুলতে পারিনি। কেন পারি নি? আমি আজন্ম সমস্ত জগৎ ভুলতে সমস্ত মায়ার বন্ধন কেটে মুক্ত পাখীর মত ব্রহ্মাকাশে ঘুরতেই ত' শিখেছিলাম। তবু যে মুহূর্ত্তে আমার পিঞ্জর দেখতে পেলাম অমনি আপনা আপনি সেই খাঁচায় ঢুকে পড়লাম কেন? আপনি শিকল পরলাম কেন? এখন দাঁড়ে বসে ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে বসে আছি, যদি খাঁচার দ্বার কেউ খুলে দেয়, যদি শিকল কেউ ছিঁড়ে দেয়! কিন্তু কৈ সেই আমার একটীমাত্র মানুষ যে এই শিকল আপন হাতে খুলে দেবে? কোথায়—

না—না—এসে কাজ নেই, খুলতে এসে কাজ নেই; যদি খুলতে এসে এই শিকলে তুমিও বাঁধা পড় তা যে আমার মর্ম্মান্তিক হবে। না—কাজ নেই—কিন্তু—আবার কিন্তু কেন? কোন কিন্তু নেই। আমার চিরমুক্তি—এই আশাই আমার আকাশ, এই আশাই আমার চিরবিচরণস্থান।

কিন্তু, কেন তুমি এই অদ্ভুৎ ভাব আমায় দিয়ে গিয়েছ তা যে বুঝতে পারলাম না প্রভু! আমার এত খানি সচেতন প্রাণ-প্রান্তরের মাঝখানে এই মূক মূঢ় পাষাণের মন্দির বসিয়ে গেলে কেন? যেখানে একদিন তুমি পা রেখেছিলে সেখানে এই বাক্যহীন বোধহীন জড় পিণ্ডের প্রতিষ্ঠা করে গেলে কেন? এ যে আমার সমস্ত দিনের সযত্ন-রচিত পূজা অর্চ্চনা সেবা তোমারই প্রতিনিধি হয়ে নিচ্ছে! একে যে মূহুর্ত্ত ছেড়ে থাকতে পারিনে, ধুয়িয়ে মুছিয়ে খাইয়ে শুইয়ে কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি না। দিনে রাত্রে হাজারবার করে এরই চার পাশে ঘুরে মরতে হয় যে। কি শক্তি এই জড় মেয়েটীর মুখের মধ্যে দেহের মধ্যে সঞ্চারিত করে গিয়েছ। এর সারা দেহে যে তোমারই বিশাল চক্ষুর সেই প্রবল দৃষ্টি ফুটে রয়েছে। আমার সারাদিন যে কেবল তোমার চ'খের সেই দৃষ্টিটা দেখতে পাই। সেই তোমার সেই

চোখ, যা শত সহস্র লক্ষ লোকের চক্ষের সামনে এই মৃতবৎ মুখের উপর রেখেছিলে, যা মাত্র এক নিমেষের জন্য আঁমারও চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকে আমার অন্তরের মধ্যে রেখেছিলে—সেই তোমার সে দিনকার প্রচণ্ড করুণার দৃষ্টিটী!

তুমি চলে গেলে, কিন্তু এমন করে বেঁধে রেখে গেলে কেন, সন্ন্যাসী ত' মুক্তি দেয়, অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্বে যিনি ব্যাপ্ত তাঁরই পরম পদই ত' দেখিয়ে দেয়। সে তো বাঁধে না। তবে তুমি সেই সে দিন অমন করে বেঁধে, অমন করে বাঁধন স্বীকার করে তবু চলে গেলে কেন? কিন্তু হে আমার সুদূরের দেবতা, এই ভক্তের বাঁধন একদিন তোমায় ক্ষণকালের জন্যও বেঁধেছিল এ কথা ত' সত্য! এ কথা ত' আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। সেই গর্ব্বেই যে আমার সারা অস্তিত্ব ভরে আছে, সে গর্ব্ব কি তুমি কেড়ে নিতে পারবে? না সে শক্তি তোমার নেই। তাই আশা হয় আবার দেখা পাব- এ আশা আমার সফল হবে, হবেই হবে।

আঃ—আবার সেই সফলতার কথা। তিনি যাবার দিন যে অমূল্য পুরস্কার আমায় দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর প্রাণের শেষ কথায় ভরা এই খাতা খানাই আমার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ লাভ বলে কেন মনে করতে পারছিনে? এই খানেতেই ত' তিনি চিরদিনের জন্য ধরা দিয়ে গিয়েছেন। আমি ত' তাই তাঁকে না পেয়ে এই খাতাখানাতেই তাঁরই পাশে দিনে দিনে আপনাকে নূতন করে ধরা দিচ্ছি। এই খাতাখানার মধ্যে তাঁরই পাশে আমার স্থান হয়েছে ত' তবে আবার কি চাই তোর? ওরে লোভী, ওরে বিশ্বগ্রাসেচ্ছু, এততেও তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না?

যাক তাঁর কথা লিখি, ওরে মন সেইদিন গুলো আবার স্মরণ কর!...

আমরা সেই মেয়েটিকে নিয়ে প্রায় সন্ধ্যার সময় বাসায় পৌছিলাম। কিন্তু তাকে এনে যে কি বিপদে পড়লাম তা বলতে পারিনে। সে কথা কয় না—উত্তর দেয় না, মড়ার মত পড়েই রইল। কি কষ্টে যে তাকে একটু দুধ খাওয়ালাম তা বলতে পারি না। ছোটছেলে তবু আপত্তি করে, কাঁদে, হাত পা ছোড়ে এবং তার কান্নাকাটীর ফাঁকে ফাঁকে, দুরন্তপনার সাহায্য নিয়েই তাকে খাইয়ে দাইয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে তোলা যায়। কিন্তু এই মেয়েটী একেবারে জড়বৎ হয়ে গিয়েছে। দুঃখের ভয়ঙ্কর ঝড়ে তার আত্মা উড়ে পালিয়েছে, কেবল দেহের কোন্ গভীর কোণে প্রাণের একটা ক্ষীণ অবশেষ রেখে গেছে। সেইটুকু

প্রাণের জোরে তার নিশ্বাস পড়ছে মাত্র, কিন্তু সেই প্রাণের শক্তি পাঁচটা ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত আর এসে পৌছাচ্ছে না। তাই সে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই আছে, কথাও নেই নড়ন চড়নও নেই।

এমনি করে সেই রাত্রিটা কেটে গেল। তারপর দিনও কাটে কাটে এমন সময় বাবা আবার সেই পরম আশ্চর্য্য মানুষকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি সমস্ত দিন ধরে সাধু দর্শন করে বেড়িয়েছেন। কি যে তাঁর মনে ছিল জানি নে কিন্তু আমি সমস্ত দিন ধরে মনে করেছি যে বাবা একটী লোকেরই খোঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি নিজে বেরুতে পারিনি, কারণ এই যে একটা জীবন্মৃত বস্তুর গুরু ভার তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন একে ছেড়ে এমন কি তাঁর খোঁজেও বেরুবো কি করে? সমস্ত দিন একটু একটু করে একে খাইয়েছি সরিয়েছি নড়িয়েছি, এই সব কাজে যারা আমার সাহায্য করেছে তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে, কারণ এই মরণাধিক মরণাচ্ছন্ন প্রাণীটী ত' শিশুর মত লঘুভারও নয় অথচ মৃতের মত একবারে জড় বস্তুও নয়। তাই এর কি যে প্রয়োজন আর কি যে অপ্রয়োজন তাত জানবার জো নেই। বিশেষতঃ সবাই এসেছে পুণ্য সঞ্চয় করতে, এরকম পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর সেবা করতে ত' কেউ আসে নি। তাই একদিন যেতে না যেতেই দাস দাসী আত্মীয় স্বজন সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমিই কেবল একে সেই মহাক্ষণের মহালাভ মনে করে আগলে বসে আছি।

কিন্তু তিনি আপনিই এলেন। এবং এমন সময় এলেন যখন আমি এর মুখে বিন্দু বিন্দু করে দুধ দিচ্ছি এবং যখন আমার চক্ষু দুটী এর মরণাচ্ছন্ন চোখ দুটীর মধ্য দিয়ে অন্য দুটী বিশাল চোখের অপূর্ব্ব দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে!

বাবার সঙ্গে তিনি এসে দাঁড়ালেন। একসঙ্গে জীবনের দুই গুরু! আমি আস্তে আস্তে উঠতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি বারণ করলেন। তার পর আস্তে আস্তে সেই মরণাহত চক্ষু দুটীর উপর ঝুঁকে পড়ে কি যে করুণায় চাইলেন তা বলতে পারিনে সেই সময় সেই কক্ষে এমন একটা স্তব্ধতা অটল হয়ে বসে ছিল যে আমার বক্ষের রক্তের তালও যেন আমার কাণে অসহ্য বোধ হচ্ছিল।

তিনি ক্ষণকাল তার দিকে চেয়ে হঠাৎ সেই করুণ দৃষ্টি আমার চোখের উপর রাখলেন। আমার যেন মনে হল আমার চোখে মধ্য দিয়ে অতি

শীতল গঙ্গা যমুনার জল তৃষিত অন্তরে প্রবেশ করল, আমি ধন্য হলাম! আমার জন্মজন্মান্তরের সমস্ত সাধনার সাফল্য যেন এক নিমেষে আমার মধ্যে ধরা দিলে! আমি ধীরে ধীরে যেখানে ছিলাম সেইখানেই বসেই তাঁকে প্রণাম করলাম। অমনি মধুর গম্ভীর শব্দ হলো "ওঁ নমো নারায়ণায়। ওঁ প্রিয়ানাম ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।"

কি মধুর সেই আবাহন! এ আবাহন ত' কেউ করেনি! ইনি এসেই একবার চেয়েই একবার ডাকতেই আমি—এই অন্তর—বেরিয়েছিলাম! এক নিমেষে আমি সমস্ত জগৎ হতে এঁর অন্তরে প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়তমা হয়ে ধরা পড়লাম। আবার ধরা দিয়েই তখনি আমি নিজের কাছেও প্রিয় হতেও প্রিয়তমা হয়ে গেলাম। ইনি এক নিমেষে আমায় এ কোন্ স্বর্গে নিয়ে গেলেন? এ কোথায় কোন্ চিরপ্রার্থিত সিংহাসনে তিনি আমায় বসিয়ে দিলেন। যখন আমি তাঁর ঐ আবাহন শুনলাম আমার অন্তরের মানুষটীও তখন না জেনেও নিশ্চয়ই বোধ হয় বলে উঠেছিল—ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে ওঁ প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে ওঁ নিধিনাম্ ত্বা নিধিপতিং হবামহে।

হে আমার লোকের মধ্যে লোকপতি তোমায় আবাহন করি। এস হে প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়তম, তোমায় স্বীকার করি। ওগো নিধির মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠনিধি এস তোমায় অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করি!

(৭)

তারপর ক'দিন যে কি রকমে কেটেছিল ভাল স্মরণ নেই। স্বপ্নে জাগরণে মাতালের মতই কেটেছিল বোধ হয়। তিনি যে কি সব কথা বলেছিলেন, কি যে তার উত্তর দিয়েছিলাম জানি না, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই ফাল্গুনের এক অপূর্ব্ব দিনে, বসন্তের এক অপূর্ব্ব প্রথম প্রকাশের মধ্যেই তিনি আমার জীবনকে চির কালের জন্য তাঁর দক্ষিণ পাণির মধ্যে গ্রহণ করলেন। আমার বাবা ত যেন চিরপ্রার্থিত বস্তু পেয়ে ধন্য হয়ে গেলেন। কি আনন্দে তিনি এই সন্ন্যাসীর হাতের মধ্যে দান করলেন তা তিনি জানেন। কিন্তু মা এবং তাঁর আত্মীয়েরা সকলেই ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন কারণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিবাহ ত' কোন শাস্ত্রেই নেই! লোকে শুনে কি বলবে? সমাজে আমার এই বিবাহ স্বীকার করবে কি? একি হল!

কিন্তু বাবার মনে কোনো দ্বিধা ছিল না—তিনি যেন হারানিধি খুঁজে পেয়েছেন, তিনি যেন চিরসাধনার সাফল্য পেয়েছেন, এমনি ভাবে সমস্ত কাজ

সম্পন্ন করলেন। সন্ন্যাসী শাস্ত্রীয় সমস্ত নিয়মই পালন করে আমায় গ্রহণ করলেন। সমস্ত রাত্রি ধরে বাবা তাঁকে আর আমাকে একত্র বসিয়ে যজ্ঞ করলেন, তারপর ভোরের সময় আমাদের দুজনকে যেন কি একটা মহান ভাবের অগ্নির মধ্যে স্বাহা মন্ত্রে উৎসর্গ করে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

আমি একবারমাত্র সন্ন্যাসীর দিকে চাইলাম, দেখলাম তিনি একদৃষ্টে যজ্ঞাগ্নির দিকে চেয়ে বসে আছেন। সেই আলোকে তাঁর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে বেষ্টিত অপূর্ব্ব মুখখানা যেন সান্ধ্যসূর্য্যের মত ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর দেখাচ্ছিল। চক্ষে ছিল তাঁর এমন একটা জ্যোতি যা কোমল নয় অথচ কঠিনও নয়—যেন দুয়েরই সংমিশ্রণ। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কেবল অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠতে লাগলাম।

তারপর বাবা যখন শেষ আহুতি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন সন্ন্যাসীও উঠে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে বল্লেন, আমি ধন্য হলাম আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।" বাবা তাঁকে আশীর্ব্বাদ করতে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। আমি তখন তাঁর পায়ে প্রণাম করতেই তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন, "আপনাকে আশীর্ব্বাদ করতে পারব না। আপনি যে আমার দান গ্রহণ করেছেন এই আমার বহুভাগ্য।"

সন্ন্যাসী একবার আমার দিকে চাইলেন তারপর বল্লেন, "কি যে করলাম জানি না, হয়ত এই বালিকার মহৎ অপকার করলাম। আমি সন্ন্যাসী হয়েও একি করলাম! মানুষ মানুষ করে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন মানুষ যে পাব তা কে জানত। আপনি যে আমায় এমন মানুষ দেবেন তা যদি জানতাম, তাহ'লে কি এমনি করে এই প্রকাণ্ড মেলার অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি? মানুষের বিরহে যত ছুটে বেড়াচ্ছিলাম ততদিন বুঝিনি যে যতদিন প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়কে না পাওয়া যাবে ততদিন ছুটোছুটী থামবে না। তাই এই বালিকার মধ্যে তাকেই খুঁজব বলে এর কাছে এসেছি। কিন্তু তবু কেন ভয় করছে?"

বাবা চুপ করে ছিলেন না, সন্ন্যাসীর শেষ কথা শুনে বল্লেন, "ভয়! আপনারও ভয় করছে?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন না। পূর্ব্বাকাশে যে উষার আভাষ দেখা যাচ্ছিল সেই দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিরে বল্লেন "হ্যাঁ ভয়ই করেছে, এই এতদিনকার সমস্ত সাধনার সংস্কার কি এক মুহূর্ত্তেই শেষ হয়ে যাবে? বোধ হয় যাবে না—বোধ হয় আবার যুদ্ধ করতে হবে।

চিরদিন কামিনীকাঞ্চনকে ঘৃণা করতেই সাধনা করে এসেছি। হঠাৎ যে আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেছি, একি মন সহজে স্বীকার করতে চাইবে? যতদিন মুক্তি সাধনা করেছি, ততদিন বন্ধন আমায় ভয়ঙ্কর জোরেই টেনেছে, আজ আবার যেই বন্ধন সাধনা করতে যাচ্ছি অমনি মুক্তি আমায় টানতে সুরু করেছে। তাই ভাবছি, কি জানি কি হয়।"

বাবা মুখ ফিরিয়ে উষার আলোর দিকে চাইলেন। ঘরের মধ্যে যে ঘৃতের বড় প্রদীপটা জ্বলছিল তার আলো ক্রমশঃ কমে আসছিল। আমি চুপ করে কাঠের মত সেই বিবাহের আসনেই বসে একবার বাবার দিকে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাচ্ছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ যখন প্রদীপ নিবে এল তখন ঐ অস্পষ্টতার মধ্যে অদ্ভুত মানুষ দুটি আমার কাছে যেন কোন এক অতীন্দ্রিয় লোকের জীব বলে বোধ হতে লাগল, তাঁদের কথা গুলি আমার কাণের মধ্য দিয়ে তন্দ্রাহীন প্রাণের এমন একটা স্থানে প্রবেশ করছিল যে আমি সে সব কথার একটিও ভুলতে পারিনি। কখনো যে পারবো তাও মনে হয় না।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন, "না কোন ভয় নেই– আমার মনে ঐ উষার আলোর মত আশা জেগে উঠছে। আমার বেশ মনে হচ্চে এর পরে এমন একটা সত্য সূর্য্যের মত জেগে উঠবে, যার আজকের এই আলো আঁধারের সমস্ত কর্ম্ম সমস্ত ভয় সমস্ত সন্দেহের অন্ধকার লজ্জায় মুখ লুকাবে। না আমার ভয় নেই—আমার চির প্রত্যাশিত সত্য তোমাদের দুজনার মধ্যে পূর্ণ প্রকাশিত দেখতে পাব। আর ভয় নেই—এস সন্ন্যাসী আজ তোমারও আমি গুরু হব—তোমাকেও আমি আশীর্ব্বাদ করব।"

বাবা এগিয়ে যেতেই সে সিংহের মত কেশর যুক্ত মাথাটি হঠাৎ নুয়ে তাঁর পায়ের কাছে এল—বাবাও তাঁকে কি একটা বৈদিক মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করলেন।

তার পর মা এলেন, দিদিমা এলেন, আরও অনেকে এলেন, আশীর্ব্বাদও করলেন, কিন্তু সেই সিংহের মত মাথাটা আর সেই প্রথম দিনকার মত উঁচু হয়ে উঠল না। মন্ত্রমুগ্ধ সেই পরম দুঃখে আমার চক্ষু জলে ভরে এল।

কিন্তু যে সিংহ গিরিগহনচারী সে তাহার চিরবিচরণ স্থান ছেড়ে কতক্ষণ এই অকিঞ্চিৎকর পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকবে। তাই তিনি দু'দিন পরেই এই যে খাতাখানিতে আমাকে গেঁথে তুলছি এই মহামূল্য বস্তুটী আমাকে দান করে চলে গেলেন। আমি তাঁকে ধরে রাখতে চেষ্টাও করিনি। কারণ এ কথা কঠিন জানতাম যে ইনি নিজে বন্ধন না স্বীকার করলে, কেউ একে বেঁধে

রাখতে পারবে না। তাই আমি একটী কথাও বলিনি, তিনিও কোনো কথা বলেন নি। শুধু যাবার সময় এই খাতাখানি আমার হাতে দিয়ে একবার আমার মুখখানা তুলে ধরেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে সেই যে মুখ ফেরালেন, সে মুখ আর ফিরল না। আমি তাঁর কটা চুলের রাশ মাত্র শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেখেছিলাম। কিন্তু সে লালে কালোয় মেশানো ধূমকেতুর পুচ্ছটী আমার মনের আকাশে চিরদিনের মত একি উজ্জ্বল রেখায় আঁকা রয়ে গেল। একি মুছবে না?—এ ধূমকেতুর সামনের তারাটী কি চরদিনের মত অন্তগতই থাকবে? তাকি কোন দিন উজ্জ্বল হয়ে আর দেখা দেবে না—শুধু এই প্রাণের জগতে উপপ্লব জাগিয়েই রেখে দেবে?

বাবা কিন্তু বলেছিলেন "যাক, আবার আসবে! আসতেই হবে! আমার আশা বিফল হবে না। জানকি, মা, ভয় নেই তোর।"

ভয় নেই বটে, কিন্তু অভয় ত নেই। সেই পরম অভয় যে দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। তারপরিবর্ত্তে একটা দুর্ণিবার কঠিন সন্তোষ যে প্রাণের মধ্যে ধীরে ধীরে আসন নেবার চেষ্টা করছে। যেন মনে হচ্ছে আমি শুকিয়ে উঠছি। কেন এই শুষ্কতা? দাবদাহ? কে আজ বলে দেবে– কেন? যিনি পারেন তিনি দূরে, যিনি পারতেন তিনিও আজ তাঁর এই অধমা কন্যাকে, তাঁর চিরকালের শিষ্যকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এ বিশাল সংসারের মরুভূমে আমায় ফেলে বাবাও আজ কতদিন হল চলে গিয়েছেন। হায় আমার জনক ঋষি তাঁর জানকীকে ফেলে কোথায় গেলেন।

জানিনা তিনি সংসারের পারে গিয়ে তাঁর চির আশার চির সাধনার কোনো সফলতা দেখতে পাচ্ছেন কিনা কিন্তু আমি যে তা পাচ্ছি না এবং আর যেন পারছিও না। অথচ সেই পরম অপরিচিতকে পাবার আশাও ত' ছাড়তে পারছি না। যতই মনকে বুঝি বাবার অন্তঃকালের শেষের কথাগুলি যতই মনকে বলছি যে, যা পাবার নয় তাকে না পাওয়াই পরম প্রাপ্তি, তবু অন্তরের অন্তরে যে আছে সে ত' কৈ বুঝছে না। তাই ত' আজও আমার চির-বাসর-শয্যায় চির-জাগরণে বসে থাকা। তাই ত' চিরদিন ধরে পথ চেয়ে সংসারের সিংহ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। অথচ যিনি আমায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনিও নেই, যাঁর আশায় থাকা তিনিও আসছেন না। অথচ সেই আশাতেই ঐ অত বড় মন্দির তৈরী হয়েছে। সেই পরম সন্ন্যাসীকে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি দেখতে পাই সেই আশাতে মা আমার জন্য ঐ অতবড় ধর্ম্ম-

শালা তৈরী করেছেন। তাঁকেও বুঝতে হয়েছে যে এই আমার অদৃষ্ট! তাই অমন যে হাস্যময়ী হাসি সেও হাসি গোপন করে, প্রতিদিন ঐ ধর্ম্মশালায় তত্ত্বাবধান করছে। অনেক দিন আগে তার বিবাহ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেও প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, যে, তার উর্ম্মিলা দিদির স্বামী না ফিরলে সে বিয়ে করবে না। অন্ততঃ তার বাবা যদি ফিরে এসে বিয়ে না দেন তাহ'লে সে তার দিদির মতই অপেক্ষা করবে। হয় তার বাবাকে চাই নয় তার দিদির স্বামীকে চাই।

তারপর কত সন্ন্যাসীই এলেন আর চলে গেলেন। বাবা বেঁচে থাকতেও অনেকে এসেছিলেন, আমার মায়ের আমলেও কতদিন কত সাধুকে সেই আমার একটী সন্ন্যাসীর আশার আশ্রয় দিয়ে কত উপদেশ কত ধর্ম্ম কথা শুনলাম। কিন্তু যে কথাটী শুনবার জন্য, যার মুখের বাণী গ্রহণ করবার জন্য আমাদের বৃহৎ সংসার সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে উন্মুখ হয়ে আছে, যাঁকে বরণ করবার জন্য আরতি করবার জন্য আমি আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ-প্রদীপ জেলে বসে আছি, কোথায় তিনি?

তুমি কি ফিরবে না? কতদিন তোমার প্রিয় হতে প্রিয়তমাকে ছেড়ে থাকবে? কতদিন ওগো—আর কতদিন!

আশাই কি আশার শেষ? বাবা ত' তাই বলে গিয়েছেন কিন্তু তাই যদি হয় তবে এই আশা করার দুঃখের শেষ করে দাও। নিরাশায় কঠিন সন্তোষকে ধরতে শেখাও। না হয় এই যাকে তোমার দেবত্বের কঠিন প্রতীক করে গেছ—এই যে মৌন জড় বস্তুকে আমার বুকের কাছে দিয়ে গেছ, আমায় এরই মত করে দাও। এই বাক্যহীন সর্ব্বচেষ্টাহীন বালিকার অবস্থার ওপরেই যেন ক্রমশঃ আমারও লোভ হচ্চে। এর সঙ্গে থেকে যে ক্রমশঃ আমারও মুকত্ব পেতে ইচ্ছে হচ্চে, জড় হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্চে। এ যেমন ভয়ঙ্কর দুঃখের আঘাতে একেবারে সুখ দুঃখের পরপারে চলে গেছে—আমারও তাতে লোভ হচ্ছে যে।

উপাসনা—মাঘ।

শিক্ষায় 'উটজ' আদর্শ।

(শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।)

"Vox populi vox dei" voice of the people is the voice of God—ভগবান ডাক ডেকেছেন—তাঁর বাঁশী বেজেছে। লোকারণ্যের বিশ্ব-মানবের মধ্যে দিয়ে প্রলয়ের বজ্রনির্ঘোষের মধ্যে দিয়ে ঐ তাঁর ডাক শোনা যাচ্ছে। "তুমি যে আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসো" ঐ সেই আলো বুঝি এসেছে। বিদ্বেষের আগাছা হৃদয়-কানন থেকে উপড়ে পড়ুক, সেখানে প্রেমের ফুল ফুটুক, সে কুঞ্জে বিশ্বের দেবতার বরণ হোক্, তিনি যে ঐ এসে প্রতীক্ষা করছেন; পূর্ণ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পঞ্চদীপে তাঁর আরতি হোক।

আমাদের এ বিরাট জাতীয় আত্মা হিমাচলের মত অচঞ্চল ও ধ্যানস্থির থেকে ত্যাগ বৈরাগ্যে ফুটে উঠুক। আর তারই পূর্ণতার মধ্যে দিয়ে আমাদের জীবন সকল অঙ্গে বিকশিত ও অবাধ হোক।

এ নবযুগের সকলই বিচিত্র, কারণ এবার লীলা হবে চমৎকার—এবার নিতাই প্রেম ব্যক্তির গণ্ডীর বাইরেও জাতীয় ভাবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জ্ঞানে কর্ম্মে সামঞ্জস্য লাভ করে সার্থক হবে। অধ্যাত্ম গণতন্ত্র বা গণতন্ত্রমূলক আধ্যাত্মিকতার উপর নূতন সভ্যতার ভিত্তি গঠিত হবে, এবার ব্যক্তিত্বের বাঁধ ভেঙে জাতিতে জাতিতে প্রেম,—এবারকার লীলা ব্যাপক। নবসৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী প্রলয়ের সময় এক এক অভিনব ভাব-জাগরণ ঘটবে; সেগুলিকে সৃষ্টিকরী শক্তিতে পরিণত করতে হবে; জীব যখন শিব হয় তখন প্রলয়ের সময় ব্যাপক-ভাবে প্রকাশিত দুর্ব্বিপাকের সংহার মূর্ত্তি প্রশমন করে মানুষ তার প্রেমের শক্তিতে তাকে মঙ্গলমূর্ত্ত করতে পারে।

ধর্ম্মজীবনের বীজ হতেই হিন্দুর এ সমাজ দেহ। সেই সমাজ ফিরিয়ে আনবার জন্য পরমার্থ জীবনে ভিত্তি করে উটজ শিক্ষালয়ের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা গ্রামে গ্রামে দরকার।

এক একটা বিশ্ববিদ্যালয় একরাতে হয় না—যদিও সেকালের রাজারা এক রাতেই পুকুর কেটে ফেলতেন আমেরিকায় এক রাতেই এক একটী পর্ব্বত-প্রমাণ ইমারত উঠতে পারে। অথচ দেশের বর্ত্তমান অবস্থাতে একটা সাময়িক ব্যবস্থাও দরকার—সময় সংক্ষেপ, ছোট ছোট ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে অর্থাৎ গাছতলাতে উটজ

স্কুলে দেশ ছেয়ে যাক্। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ দেশ নয়; যেমন বড় বড় কল কারখানার পক্ষেও এ দেশ নয়। শিল্পে যেমন উটজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার দরকার, শিক্ষাতেও তেমনই উটজ আদর্শের প্রতিষ্ঠার খুবই প্রয়োজন। অবশ্য সে আদর্শকে প্যাটাভেলের সাবলম্বী শিক্ষার ও জর্জিয়ান রিপাব্লিক স্কুলের ছাত্রতন্ত্রশাসন প্রণালীর প্রবর্ত্তনে পুষ্ট করে নিতে হবে। নিত্য ব্যবহারের জিনিষপত্র তৈয়ারীমূলক স্বাবলম্বী-শিক্ষা বর্ত্তমানে কতকটা technical education এর অভাব পূরণ করবে, ছাত্রেরা নিজেরাই আবশ্যকীয় জিনিস তৈয়ারী করবে; আর তা পরস্পরের মধ্যে ও বাইরে বেচতে পারবে। এতে তাদের পড়ার খরচও কম পড়বে ও কর্ত্তৃপক্ষদের স্কুল চালানর খরচা অনেক কম হবে। আর ছাত্রতন্ত্রস্কুলের আদর্শে ছেলেরাই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের স্থান কতকটা পূরণ করবে। আমেরিকার জর্জিয়ান রিপাব্লিক স্কুল এই রকম ছাত্রচালিত বিদ্যালয়—তা চেয়ার টেবিলে সাজান দালান কোটার কারাগার নয়। প্রকৃতির একটা সুরম্য স্থানে একটী আদর্শ শিক্ষা-পল্লী বই আর কিছুই নয়; সে সমাজে মানুষের মন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে সঙ্কুচিত ক্ষুণ্ণ হয় না। স্বভাব ও সমাজ দুয়েরই সুবিধা লাভ করে—অসীম বিকাশের সুবিধা পায়; স্বভাবের সম্পর্কে থেকে প্রাণের সুরটা বেজে ওঠে, পল্লীর ন্যায় একটী সমাজের মধ্যে থেকে কার্য্য ও চিন্তার আদান প্রদানে বিচার, পুলিশ, ব্যাঙ্ক, শিল্প, চাষ, আইন সভা প্রভৃতির কাজ নিজেরাই চালিয়ে নিয়ে বাস্তব জীবনের সত্যের ভিতর বাল্য-জীবন সজীবতা লাভ করে।

বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে ধর্ম্মশিক্ষার সে সুযোগ নাই, জোর বক্তৃতাস্থলে নৈতিক উপদেশ পর্য্যন্ত দেওয়াই আছে। কিন্তু একমাত্র আচরণের মধ্যে দিয়েই প্রকৃত শিক্ষা হয়, তাই চৈতন্যদেব প্রেমধর্ম্ম দেখিয়েছেন নিজের জীবনের দ্বারা—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" শুধু ভাল জিনিষ পড়ান ও ভাল কথাই বলা যথেষ্ট নয়। এমন পারিপার্শ্বিকের ও দৈনন্দিন আচরণের ব্যবস্থা করতে হবে যা নৈতিক জীবন অর্থাৎ যা নিয়ে আমাদের এজগতের কারবার তার গড়ন আমাদের অজ্ঞাতে করতে থাকবে। পরমপিতার নাম গানে উপাসনা, শিল্প সাধনা, নাট্য, গান ও চিত্রকলা শিক্ষা, কেতাবী বিদ্যা সেবাধর্ম্ম ও সমবায়-জীবনে দৈনন্দিন কাজগুলি এমনই ব্যবস্থিত করতে হবে যাতে শিক্ষাজীবনের দিন গুলি গানের মত মধুর হয়ে মানসিক বিকাশের সহায়তা করে। একমাত্র রেসিডেন্সিয়াল বা বসতি-বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়েই তা সম্ভবে।

গাছতলা ও চালা ঘরই তার পক্ষে যথেষ্ট। ইট পাথরে গড়া দালান কোটা এই সব মনোবৃত্তির কারাগার তার সঙ্কোচ বই বিকাশ করে না।

নূতন শিক্ষায়ই আমাদের জাতীয় সাধনার পথ খুলে যায়। পশ্চিমের মদে মাতাল পনর আনা এক আনা ছাঁটা চুলের টেরি বিলসিত, চুরুট বা নস্যের আমোদাহারী, বিরক্ত আড়ষ্ট মুখশ্রী ইন্দুরভুক্তাবশিষ্ট টুথব্রাস প্যাটার্ণের গোঁফ চড়ান মানবাকারধারীদের জায়গায় আমরা দেখতে পাব ত্যাগ ও সন্ন্যাসের আগুনে শুদ্ধ প্রেমের আলোয় ভরপুর আনন্দ-মূর্ত্ত একদল মানুষ যাদের চেহারায় ও কাজে প্রেমের স্পন্দন অনুভূত হবে, আর তারা মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে জগৎকে জাগাবে, বাঁচাবে ও গড়বে।

নবভাবের আধার সব জন্মেছে; যেন অনুকূল পারিপার্শ্বিকের অভাবে তাদের বিকাশের বাধা না হয়, নবযুগের প্রতিষ্ঠার ভার তাদেরই উপর। প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাস-কর্ম্মীই সে যজ্ঞের একমাত্র ঋত্বিক্, ভোগ বিলাসের সময় এ নয়—ভগবদ্ ইচ্ছা প্রেরিত অদৃশ্য অপ্রতিহত শক্তি-চালিত কাজের এ যুগ। সুতরাং সময়ের সুরটা ধ'রে আমাদের জীবনের সুর সেই মত বেঁধে নিয়ে এবার চলবার পালা।

যুগ-সন্ধি কাল ত উত্তীর্ণ হয়েছে। অপ্রতিহত গতিতে ভগবানের রাজ্য মর্ত্ত্যলোকেও শীঘ্র বুঝি ছেয়ে পড়লো, আধ্যাত্মিকে গণতন্ত্রে বিশ্বদেবতার ন্যায়ের রাজ্য বুঝি বা এসে পড়লো। ঐ যে তার দখিন হাওয়ার নিশ্বাসে বাংলার কুঞ্জে কুঞ্জে আজ লাল হলদে পাতার খেলা লেগে গিয়েছে; নবপল্লব আবির-রাঙা হয়ে তর তর কাঁপছে আর পুরাণ পাতার ঝরার পালা পড়ে গিয়েছে। "আয়রে নবীন আয়রে আমার কাঁচা।" এস এ শুভ মুহূর্ত্তে এ জাতীয়—এ বিশ্ব মানবীয়—জীবন প্রভাতে, হে অমৃতের সন্তানগণ অমর লোকের অযাচিত দান আশীষ নিতে মাথা পেতে দাও; সকল শক্তির উৎস তিনি তো ভাঁড়ারের চাবি খুলে দিয়েছেন—তাঁর আশীষ মাথায় নিয়ে হিংসা, দ্বেষ ভুলে, কোন জাতির প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করে, সমাজের সকল অঙ্গকে স্বাধীন করে দিয়ে, সকলে পরস্পর পরস্পরের কাজে সহায় হ'য়ে পূর্ণ সত্যের মহাপ্রকাশের খেলা খেলতে খেলতে এস আমরা এ যুগসন্ধিতে আগুয়ান হয়ে যাই—আমরা এ পুণ্য ভারতে আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের মহাসভা খুলে দিই, মায়ের আনন্দের হাটে মানুষে মানুষ চিনবে ও পৃথিবীর সকল জাতি এসে যোগ দিয়ে সহমিলনের কাজ সমাধা করবে! ধরা ধন্য হবে।

মিলন *

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।]

নীলাম্বরে শুভ্র দেহ করি আবরণ,
দূরে নীল গগন-সীমায়,
চেয়ে আছে গৌরীশৃঙ্গ সতৃষ্ণ নয়ন—
নীল আঁখি মিশে নীলিমায়!
সৃষ্টি হ'তে ধরণীর আছে ধীর, আছে স্থির;
সৃষ্টি হ'তে গতিরুদ্ধ হৃদিবদ্ধ জ্বালা,—
অনন্ত জীবন ঘেরা তবু সে একেলা!

(২)

অনন্ত জীবন জাগে অনন্ত আভাষে,
অনন্ত ভাবের সিন্ধু ছোটে,
বসে' আছে গৌরীশৃঙ্গ সে সবার পাশে
প্রাণে কথা—মুখ নাহি ফোটে।
মহান্ তবু সে দীন; আঁখি-জল রসহীন
অপাঙ্গে ঝরিছে বিন্দু নির্ম্মম কঠিন;
প্রাণপূর্ণ হিমাচল যেন প্রাণহীন।

(৩)

সম্মুখে দেখিছে গিরি দূর নীলিমায়
নীল অঙ্গ নীলে মিশাইয়া,—
বিলাস-বিভোর আশে আলিঙ্গিতে তায়
যেন কোটি বাহু প্রসারিয়া।
আসে আসে যায় ফিরে পড়ে ধরণীর তীরে
আসে কাঁদে রোদনের নাহি অবসান;—
দেখে সিন্ধু গৌরীশৃঙ্গে বিশাল মহান্।

* জাহ্নবী।

(৪)

এ পারে কঠিন প্রাণ, ও পারে তরল—
মহান্ মহানে দেখে চেয়ে,
মাঝে মরু বসুন্ধরা শূন্য ফুল-ফল,
কে দিবেরে দুটিরে মিলায়ে?
পরি চপলার মালা কাদম্বিনী ল'য়ে ডালা
আসে নিত্য অশ্রুকণা দিতে উপহার,
গিরিস্পর্শে প্রাণহীনা তুষারের ভার!

(৫)

সিন্ধুবক্ষে প্রতিদিন সুবর্ণের থালা,
ভেসে উঠে নব প্রলোভন;
কাছে এসে শিরোপরে ঢালে শুধু জ্বালা
দেহে প্রাণে হ'ল না মিলন।
কোথা আছ শক্তিমান্! মিলাতে এ দু'টি প্রাণ,
জীবনের এ সমস্যা করহে পূরণ;
দুটি মহানের আজি কর সম্মিলন।

(৬)

উঠিল করুণ কণ্ঠ ধরণীর কোলে,
কিন্নরে সে বেঁধে নিল গান,
গাহিয়া অনন্ত দিকে ছুটিয়া সকলে—
কই কোথা আছ শক্তিমান্!
ভাঙ্গি তপস্যার গেহ উত্তর না দিল কেহ,
এত শক্তি তবু কিরে শক্তিহীন তারা?
প্রেম-বারি-বিন্দুপাতে তিতিল না ধরা!

(৭)

কাঁদিয়া কিন্নর-কণ্ঠ হইল নীরব
স্বর্ণ-থালা ডুবে সিন্ধুনীরে,
অন্ধকার আবরিল ধরা-অবয়ব,
আবরিল গৌরীশৃঙ্গ শিরে,

বিষাদে ব্যাকুল হ'য়ে কল্প এল নিদ্রা ল'য়ে
ঢাকে বিশ্বে,—দেব-যক্ষ নিদ্রায় মগন ;
বুঝি, বুঝে এ অসাধ্য হ'লনা সাধন।

(৮)

কোন্ দীর্ঘ কল্প-অন্তে মধুর প্রভাতে
একিরে মধুর গীতি শুনি ,—
জাগে বিশ্ব, দেখে শিশু শুভ্র শঙ্খ হাতে
চলে, পাছে চলে কলধ্বনি।
দেবতা-অসাধ্য কাজ কে শিশু করিলি আজ ?
বিধাতার কমণ্ডলু উথলিয়া ঝরে,
এত শক্তি অস্থিহীন দেহের ভিতরে ?

(৯)

অনুরাগে কাঁদে গিরি ছোটে শুভ্র ধারা,
অনুরাগে উথলে সাগর,
অনুরাগে ফলফুলে সাজে বসুন্ধরা—
সুধা-স্রোতে তিতিলা শঙ্কর।
দগ্ধ দেহে জাগে প্রাণ, কুঞ্জে কুঞ্জে উঠে গান,
সিন্ধু হ'তে কাদম্বিনী ল'য়ে গেল ডালা,
পরে গলে গৌরীশৃঙ্গ মন্দাকিনী-মালা।

(১০)

হে বঙ্গ! তুমি যে সেই ভাগীরথী-দান,
অমৃতে রচিত তব ঘর ,
এ জগতে কেবা আছে তোমার সমান,
পুত্র তব অজর অমর।
মূঢ় চক্ষে দীনা তুমি মহীয়সী জন্মভূমি
যে বুঝে সে বুঝে তুমি জীবের উদ্ধারে,
দীনতা মাখ মা মুখে,—মহত্ত্ব অন্তরে।

নিগ্রো সমস্যা।

টোকিয়ো এবং নিউইয়র্কের "আসাই'র সংবাদ দাতা মিঃ শয়িচী মিতরো (Mr. Shoichi Mitoro) সভ্য জগতে এক নূতন সংবাদ দিতেছেন। যুগ যুগান্ত ধরিয়া নিগ্রোজাতি মার্কিণদের পদানত। আজ তাহাদের প্রাণে মুক্তির বাতাস বহিয়াছে। তাই সারা জগতের ৪০ কোটি নিগ্রোসন্তান মিলিয়া বিরাট্ এক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উহার নাম লিবেরিয়া গণতন্ত্র বা Greater Liberia Republic। নিগ্রো-নেতা মিঃ মার্কাস্ গার্ভে (Mr. Marcus Garve) নিগ্রোদের উন্নতি সঙ্ঘ বা Negro Improvement Society নামে এক সমিতি গড়েন। এই সমিতির প্রায় ৩০০ নিগ্রো প্রতিনিধির প্রাণপণ চেষ্টায় উক্ত গণতন্ত্র মহাসমিতির সৃষ্টি হয়। সমগ্র বিশ্ব ভরিয়া আজ মুক্তির বাণ ডাকিয়াছে, ইহাও তাহারই স্ফূরণ।

মার্কাস গার্ভে একজন প্রসিদ্ধ লেখক, স্বজাতির বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে তিনি আমেরিকা ও আফ্রিকায় এক ষ্টীম্ শিপ্ কোম্পানি খোলেন্। পাশ্চাত্যের এই স্বাধীন জগতে শুধু নিগ্রোদেরই দুর্দ্দশার বিষয় স্মরণ করাইয়া স্বজাতিকে তিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন। তিনি বলেন, "মুষ্টিমেয় হইয়া মার্কিণগণ যদি আমাদিগকে শাসন-কলে নিষ্পেষণ করিতে পারে তবে আমরা ৪০ কোটি নিগ্রো জীবের জীবন ভগবানের এই বীরভোগ্যা বসুন্ধরায়" কিসের জন্য আসিল? মানুষ হইয়া কেন আমরা মানুষের অধিকারে বঞ্চিত হইব? কেন নিষ্পেষিত হইব?

মনে রাখিও, নিগ্রোগণ মানুষ। মানুষের বীর্য্য লইয়া তাহারাও স্বাধীনতা লাভ করিবে। ভিক্ষায় নয়—মিনতিতে নয়—আপনার জন্মগত অধিকার হিসাবে তাহারা তাহাদের এই ন্যায্য দাবী আদায় করিবে। * * * শান্তির পথে না লাভ হয় ত কুরুক্ষেত্রকেই বরণ করিবে।"

নিগ্রোদের এই নূতন আন্দোলনে ও তৎসঙ্গে তাহাদের ধনে জনে শিক্ষায় শিল্পে উন্নতি দর্শনে মার্কিণদের এতদিনের ঘৃণা আজ যেন ভয়ে পরিণত হইয়াছে। ১৯১৯ সালের নিউইয়র্ক সমিতি বা New York Conventionএ জাপানী প্রতিনিধির সমাগম দেখিয়া এই ভীতি আরও প্রবল হইয়াছে।

"নিগ্রো ওয়ার্ল্ড" পত্রিকার সুরও ভীষণ, তাহাতে আছে, "নিগ্রোদিগের ন্যায্য দাবী আদায় করিতে গেলে যুদ্ধ বিনা আর গতি নাই, এ সময় জাপানের

সাহায্য পাইলে সিদ্ধিও নিশ্চিত। এশিয়া ও য়ুরোপে যে অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ফলে শাদায় কালায় সংগ্রাম একদিন অবশ্যম্ভাবী। সেই শুভযোগে নিগ্রোদিগকে পূর্ণ মিলন ও স্বাধীনতার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।"

মার্কিণের একদল নিগ্রোদের এই উন্নতির লক্ষণ বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন। আর একদল বলেন, "নিগ্রোদের এমন কোনও গুণ নাই যাহার জন্য মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের কোন আশঙ্কা বা মাথা ঘামাইবার কারণ থাকিতে পারে। বরঞ্চ নিগ্রো ও পীত কৃষ্ণ শ্বেতাঙ্গেতর জাতিদের এই মিলন যাহাতে না ঘটে তাহাই করা হউক ও শাসনের মাত্রা আরও একটু কঠোর করা হউক।

পাঠক! ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ ফল গণতন্ত্রী আমেরিকার মূর্ত্তিটি একবার দেখ। অহংকার এমনি অন্ধ যে এক-জনকে সাগর-জলে ডুবাইতে গিয়া নিজেরই যে কখন ডুবিতে হয় তার হিসাবটাও রাখে না। হে অহংকারের জাতি! এই যে ভেদের সমাজ ভেদের রাজতন্ত্র লইয়া বিশ্বচমক সভ্যতা রচিয়াছ তাহা টিকিবে কয় দিন? মার্কিণ জাতি! তোমরা যদি প্রকৃত গণতন্ত্রী হও, তবে নিগ্রোজাতিকে বিশ্বের দরবারে নিজের আসন খুঁজিয়া লইবার অধিকার দাও। স্মরণ রাখিও, এ নিগ্রোসমস্যা নহে—এ মানব জাতির মরাপ্রাণে বিশ্বদেবতার জোয়ার।

এসিয়ান রিভিউ - জানুয়ারী, ১৯২১।

বিরহে।

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ।]

(১)

পরাণ কাঁদি ফিরে,
সাঁতারি আঁখিনীরে,
বিরহ ব্যথা বাজে বিষম নিরদয়,
আজিকে থেকে থেকে তোমারে মনে হয়।

(২)

গগনে যত তারা,
নিবিয়া মসী পারা,
বিজনে পথ হারা চরণ থামি যায়,
ব্যাকুল বাহু দুটি তোমারে শুধু চায়।

(৩)

বিজলী থেকে থেকে,
চমকি যায় ডেকে,
ধরণী বুকে বাজ বুঝি বা হানি যায়,
তবুও তোমা পানে হৃদয় খানি ধায়।

(৪)

পরশ লাগি তব,
তুলিছে কলরব,
মুখর হৃদিবীণে হাজার খানি তার,
তোমারে নাহি পেলে জীবন কোন্ ছার।

(৫)

এস গো এস ফিরে,
মুছিয়া ধীরে ধীরে,
শতেক ব্যথা মোর মোহন তুলিকায়,
আঁধারে জ্বালো মোর নিবান দীপিকায়।

নারায়ণের নিকষ-মণি।

মোসলেম ভারত।

পৌষের "মোসলেম ভারতে" শ্রীআবদুল্লাহ আল্ আজাদের লিখিত "নন্-কো-অপারেশন বা অসহযোগিতা" অভিনব সন্দর্ভ। অসহযোগিতা সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে ভাবিবার অনেক কথা আছে। লেখক অধুনিক পাশ্চত্য সভ্যতার রূপটি দেখাইয়াছেন, তাহা যে পরিমাণে ভোগের জীবনে আনন্দ দিয়াছে তাহার সমর্থন করিয়াও সে ভোগের মত্ততা দূষণীয় বলিয়া নির্দ্ধারণ

করিয়াছেন। তাহার উপর পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ভাবগুলি ও "মানুষের সামাজিক ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে এই যে জাগরণ" তাহার সম্বন্ধে আজাদ সাহেবের আলোচনাগুলি পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত লোকের মত নয়। এ নূতন ভাবুকের প্রাণটি নিতান্তই এসিয়ার মাটিতে তৈয়ারী। প্রকৃত উচ্চ ও কল্যাণকর সভ্যতার ভিত্তি যে আধ্যাত্মিক, তাহার আভাস সমস্ত প্রবন্ধটি ভরিয়া ফুটিতে চায়, তাই বলি আল্ আজাদ এসিয়ার ছেলে। কিন্তু বড় বেদনা লাগে যখন দেখি সে অপূর্ব্ব সত্য—মানুষ যে কেবল দেহ বা মন নয়—দেহ মনের অনেক বড়, তাই তাহার যত উচ্চ সার্থক মহান ভাবগুলি সমগ্রকেই লইয়া—ক্ষুদ্র দেহগত আমিকে লইয়া নহে এই মূল কথা লেখক বলি বলি করিয়া সুস্পষ্ট করিতে পারেন নাই।

তবু আশা আছে, আগামী বারে এসত্য আরও সুস্পষ্ট রূপ ধরিতে পারে; কারণ প্রবন্ধটি ক্রমশঃ-প্রকাশ্য। যেমনি করিয়াই বলুন না কেন লেখকের বক্তব্য নারায়ণেরই বলিবার কথা। কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিলেই পাঠক দেখিবেন এ সাহিত্যিক কতখানি তলাইয়া বুঝিতে জানেন,—"কিন্তু যেইমাত্র গান্ধীর মত নির্লোভ নির্ভূষণ সন্ন্যাসী আসিয়া রাজনীতির ক্ষেত্রে নামিয়াছেন, অমনি সমস্ত ভারত ভূমি যেন উচ্ছ্বাসে আবেগে টলমল করিয়া উঠিয়াছে। ইহার মূল কথা এই যে আশু প্রয়োজনের সাধককে ভারত তেমন বিশ্বাস করিতে শিখে নাই, তা তিনি যত বড়ই ধনী মানী হউন না কেন।" আর এক স্থানে লেখক বলিতেছেন, "গণতন্ত্রের সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতা, গণশক্তি বা গণতন্ত্র প্রকৃতই একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, শুধু সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের কথা নহে।"

অসহযোগিতায় শাসকবর্গের বা যে কোন স্বদেশীয় বা বিদেশীয় অত্যাচারীর "শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার ও প্রভুত্বের অভিলাষ" ঘুচে কিনা তাহার আলোচনা তুচ্ছ কথা। যে কোন আন্দোলন বা ভাবপ্রবাহ মানুষকে ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে অপ্রেম হইতে প্রেমে মৃত্যু হইতে জীবনে যতটুকু লইয়া যায় সে আন্দোলন ততটুকুই সার্থক। প্লাবনের বাণ ডাকিয়া বহিয়া গেলে ধ্বংসের কথা মানুষ ধরে না, মানুষ দেখে এ নূতন পলি মাটিতে ধরিত্রীকে কতখানি উর্ব্বরা করিয়াছে। সমস্ত মানব সভ্যতার লক্ষ্যই মুক্তি—মানুষের ক্ষুদ্র হইতে বৃহতে—ভূমায় মুক্তি, যে বৃহৎ জাগিয়া এ জগৎ আনন্দের ছন্দে বাঁধিয়া দেয় অণুকেও আপন আলোকে দীপ্ত করে।

সাহিত্যিকা।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত ও ৪।এ মোহন লাল ষ্ট্রীটের আর্য্য পাবলিশিং হাউসের দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ১৷৷০ টাকা।

নলিনী শ্রীঅরবিন্দের হাতের গড়া প্রাণ—তাই জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার। নলিনীর লেখার মত এমন চিন্তা ও ভাবের ঠাস-বুনানীর লেখা বাঙ্গলা ভাষায় খুব কম এসেছে। প্রকৃত গুরু বা শিক্ষক কি একটা অন্তর্নিহিত জ্ঞানের নাড়ী ছুঁয়ে দেয় আর কবে কোন্ স্থলগ্নে আত্মদেবতার শুভ উষায় মনপদ্ম খুলে যায়। যার জীবনে এই দুর্লভ আত্ম-বোধন ঘটেছে তার বলবার কথা—বাজাবার রাগিণী ফুরাতে চায় না, সে হেলায় সৃষ্টির আনন্দে দু'হাতে কেবল দিয়েই যায়—অশ্রান্ত সুখে চিন্তামণির নচিদুয়ারের মণিরত্ন চারিদিকে ছড়িয়ে মাতৃভাষাকে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিতা করে যায়। শ্রীঅরবিন্দের দশ বৎসরের প্রবাসবাসে নলিনী সঙ্গে সঙ্গে থেকে যে ভাণ্ডারের চাবি পেয়েছে তার রত্নগুলি আর্য্য পাবলিশিং হাউস বাঙ্গলার দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেবে।

এ বইখানিতে বারটি বিষয়ে বারটি প্রবন্ধ আছে, যথা,—কবিত্বের ত্রিধারা, স্বদেশী সাহিত্য, বিশ্ব-সাহিত্য, মিস্টিক্ কবি, ইউরোপীয় ট্রাজেডি ও ভারতীয় করুণ রস, আর্টের আধ্যাত্মিকতা, কাব্য ও তত্ত্ব, প্রতিভার কথা, শিল্পকলার কথা, চলিত ভাষা ও সাধুভাষা, চলিতভাষা ও সাধুভাষা (অনুবৃত্তি) এবং সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য।

সাহিত্যিকার পাঠক ভারতে শুধু বাঙ্গালা দেশেই আছে, বঙ্গ স্বাধীন দেশ হলে ভাষার রাজপাট এদেশে থাকলে সাহিত্যিকা Classicsএর মধ্যে গণ্য হ'তো। অন্য বই সম্বন্ধে স্তুতির অতিশয়োক্তি করতে গিয়ে যে কথা বলতে হয় সাহিত্যিকার সম্বন্ধে সে কথা স্বরূপ-বর্ণন মাত্র। এ বইএর সমালোচক খুঁজে সমালোচনা করাবার ইচ্ছা আছে, সে দরের সমালোচক দেশে খুব বেশি নেই। বইখানির যে মাধুর্য্য ও ভাবসম্পদ বলে বোঝাতে পারলাম না নারায়ণের পাঠক তা' পড়ে রসাস্বাদ করে দেখবেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবন চরিত—শ্রীহেমলতা দেবী প্রণীত, দি নিউ ইরা পাবলিশিং হাউস ১।৮নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট—প্রকাশিত, মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনী পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি—বইখানি শাস্ত্রী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রণীত। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্তের জীবনী লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিতা নন। জাতীয় জীবনের সুলক্ষণ বটে যে আমরা দেশের বড়লোকদিগকে কিঞ্চিৎ আদর করিতে শিখিয়াছি। গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী হেমলতা দেবী শ্রীশিবনাথের আদর্শ চরিত্র বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া লেখনী সার্থক করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মজীবনী এবং ইংরেজী ভাষায় লিখিত সুবৃহৎ ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এ পুস্তক প্রণীত; এতদ্ব্যতীত পিতার সম্বন্ধে কন্যার অভিজ্ঞতার মূল্যও কম নয়। পিতার জীবনী লিখিতে গিয়া ইনি যথাসম্ভব সংযম রক্ষা করিয়া প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন। মাঝে মাঝে দুই এক জায়গায় সংযমের বাঁধ খসিয়া পড়িয়াছে, হৃদয়বান্ পাঠক তাহা ক্ষমা করিবেন।

হরানন্দ ও গোলোকমণির সংসার চিত্রটি উপন্যাসের মতন চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শিবনাথের জীবনপদ্ম শান্ত স্বচ্ছ কৌমুদীস্নাত তোয়ের সহিত খেলা করিতে করিতে তাহার শুভ্র পাপড়িদল আকাশে সুখে স্বচ্ছন্দে মেলিয়া দেয় নাই, এতো সৌম্য বিকচ পদ্মবিলাস নয়, এ যে জীবনবহ্নির রঙ্গ, চারিদিকের ঘনঘোর অন্ধকারের মাঝে জীবনপ্রদীপের জ্যোতিঃ বিকিরণ! মনে করি অন্ধকারকে ঠেলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে আলোর বুঝি শুধু বিজয়গর্ব্বই হয়, তা' নয়—আলোরও যে এতে কত ব্যথা কত বেদনা তা'র কতটুকু ইতিহাস আমরা জানি? শিবনাথ যৌবনে মাতাপিতার বুকে ঘা দিয়া বিবেকের আলোককে চিরজীবন অনুসরণ করিয়াছিলেন,—এক হাতে তিনি চোখের জল মুছিয়াছেন, অন্য হাত বুকে রাখিয়া ভগবানের প্রেম অনুভব করিয়াছেন, বুকের অর্দ্ধেকখানি বিচ্ছেদবেদনায় অহরহ জ্বলিয়াছে, অপরার্দ্ধ কাহার হস্তস্পর্শে শীতল হইয়াছে? জানি না শিবনাথ তাঁহার জীবন দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন কি না, কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে তাঁহার ন্যায় একনিষ্ঠ অভিসারযাত্রী জগতে দুর্ল্লভ এবং তিনি চিরকাল দীপশিখা জ্বলাইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার অপেক্ষায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছিলেন।

যে যুগে সম্প্রদায়সৃষ্টি দ্বারা জগতের কল্যাণ উদ্ভাবিত হইত, স্বর্গীয় শিবনাথ সেই যুগেরই অন্যতম প্রবর্ত্তক এবং বোধ হয় তাহার শেষ দেখিয়াই এ

জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। জগতের ইতিহাসে সে যুগেরও প্রয়োজন ছিল, রামমোহন কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ না জন্মিলে আমরা আজ গান্ধি রবীন্দ্র অরবিন্দ চিত্তরঞ্জনকে পাইতাম না।

রূপম্।

এবার ভারতীয় কলাভবনের মুখপত্র "রূপমের" চতুর্থ সংখ্যা পীতবাসে ও চিত্রসম্পদে সাজিয়া অভিসার সাজে বাহির হইয়াছে। কঞ্জিভেরামের দেবমন্দিরের অপূর্ব্ব দীপাধার গুলির চিত্রাবলি বড় মনোজ্ঞ—তাহার কোনটি দ্বীপ হস্তে কিন্নরী কোনটি বা গড়ূর আর কোনটি দ্বীপলক্ষ্মীর প্রতিরূপ। হায়দ্রাবাদের রাজান্তঃপুরবাসীনীর ছবিখানিতে মুখশ্রী ও মাধুরী যথেষ্ট আছে, নাই অন্তররাজ্যের মহাকাব্য। স্বাধীনপতিকা, সম্ভোগ, নবোঢ়া, আগত ভর্ত্তিকা, অভিসারিকা, মুগ্ধা, প্রোষিতভর্ত্তিকা স্মরান্ধা ও রূপগর্ব্বিতার ছবি গুলি বড় উচ্চাঙ্গের, হিন্দুর রসশাস্ত্রে প্রেমবৈচিত্রের কি চূড়ান্ত পরিণতিই হইয়াছিল এগুলি তাহারই নিদর্শন। জাতি যতক্ষণ জীবন্ত থাকে ততক্ষণ তাহার সৃষ্টিবৈচিত্র হয় এমনি বহুভঙ্গিম।

তামি কুমে নামক জাপানী চিত্রকরের সূত্রে চিত্রকলার কথা জেমস্ কুজিন যাহা লিখিয়াছেন তাহা বড় উপাদেয় হইয়াছে। যদি জাপানী শিল্প বলিয়া কুমেয় পরিচয় দেওয়া হইত তাহা হইলে সে বলিত, "আমি জাপানী চিত্রশিল্পী নই আমি শুধু চিত্রকবি। যাহার জাতি বর্ণ গোত্রের জ্ঞান আছে সে দেখে চোখের কাছে একটি ক্ষুদ্র দীপ, সেই নেত্রতারা-সংলগ্ন দীপের জ্যোতি টুকুই চক্ষু ছাইয়া বহিঃ ও অন্তর সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখে। চিত্র-কবি কোনও বিশেষ দেশের নয়, সে নিবিড়ের—অতলতলের বার্ত্তাবহ। সে কোন পদ্ধতি বা নিয়মের দাস নহে—কারণ সে যে স্বয়ং শীব স্বয়ং ভাব নিধি।

ভাবের মাঝে—এ প্রেরণার স্রোত যে একটি রুদ্ধশ্বাস মহাক্ষণের বিলসন, যখন অসীম ও সসীমের দুটি আত্মার এই আলাপচারী হয় তখন তাহাতে রীতি পদ্ধতির কল কব্জা কোথায়! কুমে বলেন অন্তর্দর্শনের গিরি শৃঙ্গে যখন আমি থাকি, তখনই আমি চিত্র-কবি তখনই আমি মূক। সেখানে গায়কের গান হারাইয়া গিয়াছে। তখন আর চিত্র রঙে আঁকা যায় না, কারণ তখন অন্তরের গোপন কবি নিজে তুলি ধরিয়াছে। কোন বিশেষ দেশের ভঙ্গীর চিত্রকর

সে বৈকুণ্ঠের- বাহিরের দৌবারিক মাত্র, যখন কবির মাঝে মানুষ বা জাতি ফুরাইয়া যায় তখনই না স্রষ্টা জাগে।

প্রথমে চোখের দৃষ্টি দিয়া মানুষ চিত্র আঁকে, তাহার পর হৃদয়ের স্নেহ প্রেম মান অভিমান প্রভৃতির রসে ডুবাইয়া তুলি ধরে, সব শেষে আসে ভাবের মহাকাব্য। কুমে তাঁর চিত্রে হৃদয় বৃত্তি ফুটাইয়া তুলেন না, তাঁর আঁকা রঙে অশ্রু-ঢলঢল ব্যক্ত বেদনা নাই, সব চিত্রটি ভরিয়া কবির আনন্দ মূক মহাপ্লাবনে ভরিয়া থাকে। বীণাপাণির অঞ্চল ধরিয়া কুমে ভাবগিরির সেই ফুজিয়ামা শৃঙ্গে উপনীত হন যেখানে ব্যক্তের বাস্তবের রূঢ় বর্ণ-গরিমা ও মায়াজাল নাই, সেখানে অনাবরণ আত্মধনের কাছে তাঁহার তুলি পট সবই নতজানু।

কুমে বলেন, যে, যখন এ ভূমার অন্তপুরে এই বৈকুণ্ঠমুখী সুবর্ণ আরোহণীর একটি ধাপ উঠি তখন বুক ভরিয়া যে আনন্দ আকুলি ব্যাকুলি করিয়া নাচে তাহাতে কেবল এই বারতা বহিয়া আনে যে সমুখে এ অভিসারের ঐ যে আর একটি পাদ পীট। ক্ষুদ্র শিল্পে ব্যক্ত করিয়া বাস্তবকেই দেখায় কিন্তু চিত্রকলার মহাকাব্য অনন্তের ছায়ায় অনন্তের চুপি চুপি গোপন কথায় ভরা। আজ শিল্পকলা নবীন রচনার জন্য নূতন জগত খুঁজিতেছে, কিন্তু সেই অবসরে কোথা হইতে অকূল নিবিড় বুঝি বহিয়া আসিয়া তাহার অগণ্য ভুবনের রহস্যে কলা জগত জয় করিল।"

শিক্ষায় নবীন সৃষ্টি।

(২)

ভগবানের এই বিশ্বের জীবনে বিশেষ করে একটা সৃষ্টির দিন এসেছিল আর এতদিন স্থিতি ও পালনের যুগ গেল ও এখনও যাচ্ছে, এবং শোনা যায় যে দ্বাদশ সূর্য্য উদয় হয়ে জলপ্লাবনে আর একদিন নাকি এ পোড়া সৃষ্টি ধ্বংস ও হবে। এই রকম সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনটে বিশেষ দিন থাকলেও মোটামুটি রকমের গড়াভাঙাগুলো কিন্তু একসঙ্গেও চলে। আমাদের জাতিরও জীবনে এমনি বিশেষ করে সৃষ্টির দিন, বিশেষ করে স্থিতির আবার বিশেষ করে ধ্বংসের দিন বার বার এসেছে। এতদিন মহানিদ্রার মরণে মরে ছিলাম, রজের মূর্ত্তি ইংরাজ এ তামস জাতটাকে হঠাৎ ঘুমন্ত বেঁধে ফেলে আস্তে আস্তে জ্ঞান করিয়ে নিজের ভাবের সুরায় মাতাল করে রাখবার জোগাড়ে ছিল।

পশ্চিমের বড় সাধ ছিল যে ভারতের এ জ্ঞানী জাত যদি কখন জাগে যেন ভূতাবিষ্ট পাশ্চাত্যের ভাবভূতে আবিষ্ট হয়েই জাগে। সে চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নি, আমরা জেগেই arise awake O Mother India বলে বার্কের ঢঙে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। মা কিন্তু সন্তানের মুখে বিদেশী বুলি বুঝতে পারলেন না।

কিন্তু বিধি কিনা নিতান্তই ভারতকে অমর করে গড়েছেন, তাই আজ এ ঘোর নেশা ছুটে সাড় এসেছে। আজ অন্তরে বোধ জেগেছে যে আমাদের সত্যকার বাঁচা বাঁচতে হবে, আত্মসাধন মন্ত্রে ভূত ছাড়িয়ে আপন তাজা প্রাণ ফিরে পেতে হ'বে। পশ্চিম বুঝতে পারে নি, যে অখণ্ড জ্ঞান যার স্বরূপ জগতের সেই ভাব-গুরু এসিয়া কখন ভাবের মরণ মরতে পারে না, পাশ্চাত্য টের পায় নি, যে, তীব্র পশ্চিমী সুরায় ভারতকে জাগালে সে তপোমগ্ন ঋষি আপন তপস্যার সিদ্ধি নিয়েই জাগবে। তাই বলি বিষম মরণ মরার পর এ আবার নতুন করে সৃষ্টির যুগ এলো, এখন শুধু যে দেশ-আত্মার বোধন চাই তা' নয়, অনেক জিনিষ যুগের নতুন আলোয় নতুন করে পড়া চাই। সনাতন ভারত পুনর্জীবন পাবে, পেয়ে দেশকালোপযোগী নতুন রাজবেশ ছত্র দণ্ড ধরবে।

তাই জাতীয় শিক্ষায় প্রথম কথা দেশ আত্মার বোধন। এমন ধন ফিরে পাও যে ধন নই'লে ভারত শব, যে প্রাণস্পর্শ না ঘটলে ভারত কখনও নড়ে না—সৃষ্টিলীলায় ব্রহ্মশক্তি হয়ে নাচে না। বাংলায় বহুদিন হল সে পরম সত্য এসেছে, তাই যখন আমরা আন্দামানে তখন ইংলণ্ডের একজন শ্রমজীবীদলের নেতা এসে অরবিন্দ শিশির কুমার প্রভৃতিকে দেখে লিখেছিলেন, "But Bengal is doing better than making political parties. It is translating nationalism into religion. into music and poetry, into painting and literature."—"বাঙলা রাজনীতিক দল সৃষ্টি করার চেয়েও ঢের বড় কাজ করছে, কারণ বাঙলা জাতীয়তাকে ধর্ম্মে, কবিতায় গানে চিত্রে শিল্পে সাহিত্যে রূপান্তর করে নিচ্ছে।" যখন দেশ আত্মা –The soal of a nation জাগে তখন এমনই হয়, জীবনহিল্লোল ভাগবত শক্তিতে জাতির সব অঙ্গ নখর নবীন লাবণ্য-ঢল-ঢল করে তোলে।

বাঙলা যে বেঁচেছে—পাশ্চাত্যের সুরা পান করে ঘুম ভেঙে নিজের আত্ম শক্তিই ফিরে পেয়েছে, তার প্রমান রামমোহন ভূদেব বঙ্কিম বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ চিত্তরঞ্জন অরবিন্দ। তাই দেখনা পাশ্চাত্য চিত্র-শিল্প শিখে আমাদের অবনীন্দ্র মাটিতে বসে অজন্তার ছবি আঁকতে লেগে গেল! কৈ, যীশুর কোলে মেরী ত আঁকলো না? কৈ, বর্ণে রূপে মাধুর্য্যে দেহের কবিতা সেই গ্রীক শিল্পীর ভোগের স্বপ্ন তুলির মুখে ত ফলাল না? বাঙলার জগদীশ দেখ জড় বিজ্ঞানের সত্য যা' খুলে দিল তা ঋষির সাধন-ধন—উপনিষদের প্রতিপাদ্য তত্ত্ব! সে দিন একজন ইঙ্গবঙ্গ বন্ধু শ্লেষ করে বলছিলেন, "জগদীশ বিজ্ঞান শিখে কি করলেন, না জড়ে গাছ পালায় জীবন আছে তাই দেখালেন!" বন্ধুটির বড় আক্ষেপ যে কতগুলো কল কব্জা ধোঁয়াগাড়ী গড়ে আচার্য্যদেব ভারতের মানুষকে সহজলভ্য টাকার ছালা দেখিয়ে দিলেন না কেন।

আর একটি নবীন তরুণ বন্ধু অনেকবার আমাদের কাছে যাতায়াত করেছেন। তাঁর ধারণা জগতের ইতিহাসে নাকি কোথায়ও দেখা যায় না যে অধ্যাত্মে ধর্ম্মে জাতিকে বড় করে বা তার সভ্যতা গড়ে দেয়। পাঠক! একবার বুঝে দেখুন ইংরাজি স্কুলে ইতিহাস পড়ে ভারতের আত্মা কি রকম শিঙেই ফুঁকেছে, কি বিষম মারাত্মক মরণই মরেছে! ফরাসী জাতি যে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ভাব ধন নিয়ে জেগেছিল যে জাগরণের শক্তিমন্ত্র স্বার্থমুখী য়ুরোপকে আজও যদুবংশ ধ্বংশ থেকে রক্ষা করে আসছে, সে তত্ত্ব —সে ভাবধন কি আধ্যাত্মিক নয়? আমেরিকায় মার্কিন গণতন্ত্র মানবের যে পরম মুক্তির আশায় ভিত গেড়ে সৌধ রচনা করেছে—সে জীবনবেদ কি আধ্যাত্মিক নয়? এসিরায় বুদ্ধ শঙ্কর কন্‌ফিউসিয়াস যে তত্ত্ববীজ নিয়ে কত কত মহাদেশব্যাপী সভ্যতা ও রাজপীঠ রচনা করিয়ে গেছেন সে শক্তিবীজ কি আধ্যাত্মিক নয়? শক্তির খর চিরদিনই সূক্ষ্মে বা কারণে, তাই তা' লোক চক্ষুর অগোচরে; তার বাহিরের প্রকাশ দেখেই মানুষ ভুলে যায়, ভাবে বুঝি শক্তির চেয়ে এ শক্তি-সিন্দুর ঢেউ বড়। মন প্রাণ দেহই শুধু মানুষ নয়, ওগুলি প্রকৃত মানুষের প্রতিমা—তার আনন্দ আস্বাদনের পাত্র তার প্রকাশের যন্ত্র। প্রকৃত মানুষের ইতি নাই, কি শক্তির দিক দিয়ে কি আনন্দের পরিমাণে মানুষ সব দিক দিয়েই অসীম অকূল অফুরন্ত। মানুষের একদিকটা জীব আর একদিকটা শিব, শিব থেকে জ্ঞানশক্তি আনন্দ বয়ে আসে আর জীব থেকে সৃষ্টি হয়। এই অখণ্ড দৃষ্টিই ভারতের ধারা—এই ধন এই দিব্য ত্রিনেত্র লাভ করে জাতীয় শিক্ষার ভিত রচনা করতে হবে।

আগে গুরু শিষ্যকে জ্ঞান দিত, আশ্রমে বসে গাছের তলায় তপশ্চানিরত

গুরু শিষ্যকে ক'খানা বই পড়াত? কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের জ্ঞানী শিক্ষক বুঝতো মানুষ বইপড়া জ্ঞান ভরে দেবার একটা নির্জ্জীব চোঙ নয়—শিক্ষার যন্ত্র নয়, মানুষ একটা জীবন্ত কিছু—বড় সূক্ষ্ম জটিল, নিজেই জ্ঞানের উৎস। তাকে পাঁশ গাদা বা আঁস্তাকুড় (dust bin) করে বাহির থেকে তার মধ্যে জ্ঞান ফেলে দেওয়া যায় না, তার অন্তর্নিহিত রুদ্ধ জ্ঞান অমোঘ স্পর্শে ফুটিয়ে তুলতে হয়। গুরু তাই করতেন, এমন এক জ্ঞানের নাড়ী ছুঁয়ে দিতেন, যার চেতনায় কোন্ শুভ লগ্নে তার মর্ম্ম-পদ্ম খুলে যেত, আর তারপর এক মঙ্গল উষায় অপূর্ব্ব তপোবল জ্ঞানবল ও আনন্দধন নিয়ে আশ্রম থেকে এক বাঁধনহারা মহাকর্ম্মী বেরিয়ে সংসারে আসতো। এর নাম শিক্ষা—এর নাম আত্মবোধন; অন্তরের জ্ঞান-উৎসের মুখ না খুলে দিতে পারলে—মানুষকে শক্তি ও সৃষ্টির ডাইনামো না করে নিতে পারলে বাহির থেকে পরের চর্ব্বিত জ্ঞান ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জ্ঞানবাহী গর্দ্দভই করবে, জ্ঞানী করতে পারবে না।

জাগা মানুষই কেবল জ্ঞান ধন দিতে পারে; জ্ঞানের আধার মানুষের এই বিরাট আমির যেমন দুই দিক—এক এই ছোট প্রকাশ আমি, দেহ প্রাণ মন; আর সেই তার মূল সর্ব্ববীজ কারণ আমি। এক জীব আর শিব, তেমনি এই অনন্ত মানুষের শিক্ষার দিকও দুই—পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা। এই দুই নিয়ে জ্ঞান পূর্ণ। অন্তর্জগতের পরা বিদ্যা এসিয়ার জীবন সাধনা আর বহির্জগতের অপরা বিদ্যা পাশ্চাত্যের জীবন সাধনা; এত দিনের এই দুই সাধনা মিলিয়ে তবে জীবন-বেদ। জাতীয় বিদ্যালয়ে এই তত্ত্বের তত্ত্বজ্ঞ গুরু বসে সম্পূর্ণ জীবন-বেদ বিদ্যার্থীকে দেবে। সেই জীবন্ত বিদ্যালয়ে জ্ঞান শিখে মানুষ হয়ে নিত্য আনন্দে পূর্ণ জ্ঞানী হয়ে যারা বাহির হবে, তারা দেশকে আবার ভারত করে গড়বে, আবার মরা এসিয়াকে প্রাণদান দিয়ে জগতে মানুষের চির মুক্তির (Spiritual democracy) গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

———

রচনা—হাবিলদার কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম্।

সুর ও স্বরলিপি।

[শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।]

আস্থায়ী।

২´ ৩ ০ ১
II { সা সর্সা। না -রা সা। ধধা না। ধা পা -রা I
{ প থিক্ ও ০ গো চল্ তে প থে ০

২´ ৩ ০ ১
I রা গগা। মা —পধা পপা। মা গমরা। না রা সা I
তো মায়্ আ ০০ মায়্ প থে০র্ দে ০ খা

অন্তরা।

২´ ৩ ০ ১
I সা না। ধ্ পা —া। সরা গা। মা পা —া I
ঐ দে খা তে ই দুই টি হি য়া র্

২´ ৩ ০ ১
I ধধা না। র্সধা পা —া। মা গমরা। না রা সা } II
জাগ্ লো প্রে০ মে র্ গ ভী০র্ রে ০ খা }

অন্তরা।

২´ ৩ ১
II { পপা ধা। র্সা —ধা না। র্সা র্সর্সা। না —র্রা র্সা
{ এই যে দে ০ খা শ রৎ শে ০ ষে

২´ ৩ ০ ১
I র্রা র্গর্গা। র্মা —া র্পা। র্মা র্গর্মর্রা। না র্রা র্সা } I
প থের্ মা ০ ঝে অ চি০ন্ দে ০ শে }

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা। না র্সা —া। ধা ননা। ধা —া পা I
কে জা নে ভা ই ক খন্ কে ০ সে

২´ ৩ ০ ১
I ররা গা। মধা পা —া। মগমা রা। না —রা সা II
চল্ বো আ০ বা র্ প০থ্ টি এ ০ কা

সঞ্চারী।

২´ ৩ ০ ১
II { পপা মা। গা রা —গা। মমা পা। পমধা পা —া I
{ এই যে মো দে র্ এক্ টু চে০০ না র্

২´ ৩ ০ ১
I ধধা না। র্সনা ধা —পা। মা গরা। না —রা সা I
আব্ ছা য়া০ তে ই বে দন্ জা ০ গে

২´ ৩ ০ ১
I সা ন্না। ধ্ধ্া পা —া। সা রগা। মা মা পা I
কা গুন্ হাও য়া র্ ম দির্ ছোঁ ও য়া

২´ ৩ ০ ১
I ধা ননা। ধা না ধপা। মা গমা। রা —া সা } I
পূ রের্ হা ও যার্ কাঁ পন্ লা ০ গে }

আভোগ।

২´ ৩ ০ ১
I { পপা র্সধা। নর্সা র্রা —া। নর্সা র্সা। নর্রা র্সা —া I
{ হয় ত০ মো০ দে র্ শেষ্ দে খা০ এ ই

২´ ৩ ০ ২
I ধধা না। র্সা —না র্রা। র্সা ধনা। ধা পা —া I
এম্ নি ক ০ রে প থের্ বাঁ কে ই

২´ ৩ ০ ১
I র্সর্সা র্রা। না —া র্সনর্রা। ধধা না। ধা পা —পরা I
রই ল শু ০ ধু০০ চার্ টি আঁ খে ০ই

২´ ৩ ০ ১
I রা গগা। মধা পা —া। মা গমরা। না রা সা } IIII
চে নার্ বে০ দ ন্ নি বি০ড়্ লে ০ খা }

চাক্‌রের ছুটি।

[শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ।]

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর রাত্রি দশটার সময় অবসর পাইয়া সতীশ কাঁধে একখানা ভিজে গামছা আর হাতে হুঁকো কলকে লইয়া ছাদের খোলা বাতাসে আসিয়া যখন একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিল, তখন লোকে যাকে বলে পুনর্জীবনলাভ করা, সতীশ বোধ করি সেই রকমেরই একটা কিছু লাভ করিল। তার পর বসিয়া, হাতের আড়ালে দেশলাই জ্বালাইয়া একখানি টিকে ধরাইয়া, বাঁ-হাতটী উঁচু করিয়া টিকেখানি বাতাসে ধরিয়া রহিল, আর ডানহাতের হুঁকাটীর মুখে ফুঁ দিয়া অতিরিক্ত জলটুকু ফেলিয়া দিতে লাগিল। ঠিক এমনি সময়ে রাজেন আসিয়া সতীশের নিকটে ছুটিয়া গিয়া বলিল, "বাঁচা গেল ভাই—ছুটী ত পেলাম!" সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "বেশ, বেশ, বাবু কি বল্‌লেন?"

রাজেন—"কি আর বলেন বল, ছ'মাস হ'ল বাড়ী থেকে এসেছি,—ছুটী না দিলে কি ছাড়তাম।"

সতীশ "তা হ'লে কবে যাচ্ছ? কালই নাকি?"

রাজেন "কাল আর কি করে যাই, ভাই, কিনতে কাটতে হবে! পরশু যাব মনে করছি!"

রাজেনের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় কুসুমপুর নামক একটী গ্রামে। কলিকাতায় চাকরী করে, বড়বাজারের চিনেপটীতে মহেন্দ্র গোঁএর গদীতে বার টাকা বেতনের একজন 'গোমস্তা' প্রায় ছয়মাস হইল সে বাড়ী হইতে আসিয়াছে, তাই বাড়ী যাইবার জন্য আজ সে বাবুর নিকট ছুটী চাহিতে গিয়াছিল। রাত্রি সাড়ে নয়টার পর, তহবিল মিলাইয়া, আহারান্তে, তাকিয়ায় টেসান দিয়া, গুড়গুড়ীর নল মুখে বাবু যখন 'বিশ্রাম' করেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময়টীতেই বাবুর মেজাজটী কিঞ্চিৎ নরম থাকে। রাজেন ঠিক সেই সময়েই গিয়া তাহার আবেদন জানাইল। সর্ব্বদাই খিট্ খিটে এই বাবুটী গদীর প্রায় সকলেরই উপর কোন না কোন কারণে চটা; কিন্তু এই রাজেনের উপর কোনদিনই চটেন নাই; কারণ তিনি কোনদিন তাহার কাজে বা ব্যবহারে বড় একটা 'ভুলচুক' বা 'খুঁত' ধরিতে পারেন নাই।

অধিকন্তু রাজেন ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া বাবু তাহাকে একটু ভয় ও ভক্তি করিতেন, কারণ এই দোকানেরই কোন্ এক ব্রাহ্মণের অভিশাপে তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের একটা দুরারোগ্য ব্যাধি হইয়াছিল, ইহাই তাঁহার ধারণা। কাজেই রাজেন ছুটী চাহিলে বাবু বলিলেন "তাইত হে,—এ সময় গদীতে লোক জন কম—" পরে গুড়গুড়ীর নলে আর একটা টান দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, যাও, কিন্তু ৭ দিনের মধ্যে আসা চাই।" রাজেন ছুটী পাইয়াই আগে তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু সতীশকে খবর দিতে গেল। সতীশও ঐ এক দোকানেরই কর্ম্মচারী; তার কাজ তাগাদা করা।

শুধু বাবু কেন গদীর প্রায় সকলেই রাজেনকে ভক্তি করিত, এত দারিদ্র্যে-জীর্ণ শীর্ণ মানুষ অথচ এত বিশ্বাসী ও সৎস্বভাব খুব কম পাওয়া যায়। রাজেন অনাহারে থাকিত কিন্তু মনিবের টাকা গোরক্ত জ্ঞান করিত। বয়স তাহার আন্দাজ ত্রিশের দুই এক বছর বেশী হইবে। সংসারে মা, দুইটী পুত্র ও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। প্রথম পক্ষের স্ত্রী যেদিন দুইটী পুত্র রাখিয়া মারা যায়, সে আজ চারি বৎসরের কথা। তারপর কিছুদিন যাইতে না যাইতেই ঘটক আসিয়া রাজেনের মাকে ধরিয়া বসিল। তিনিও বলিলেন, "বিয়ে দিতে হবে বৈকি, ছেলের আমার বয়স কোথা? তবে কি জানেন—মেয়ে একটু বড় সড় হয়, এসেই ঘরকন্না করতে পারে, এমনি ধারাটী হ'লেই যেন আমার ভাল হয়; দেখ্‌ছেন ত আমি বুড়ো হাবড়া—"। ঘটকমহাশয়ও অমনি "তা বৈকি, তা বৈকি, সেই রকম মেয়েই আমার হাতে আছে—" বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং নিজের কাজ গুছাইয়াছেন ভাবিয়া মনে মনে আনন্দিত হইলেন। কিছুদিন পরেই একটী চৌদ্দ বছরের মেয়ের সঙ্গে রাজেনের বিবাহ হইয়া গেল। এত দারিদ্র্যে নিষ্পিষ্ট রাজেনের আপত্তি করিবারও বুঝি শক্তি ছিল না, সে সকল বিষয়েই নির্ব্বিকার। শাশুড়ী 'ধুলো পায়ে দিন করাইয়া বৌকে ঘরে আনিলেন। নূতন বৌ আসিয়া ছেলেদুটীকে আদর যত্ন করিতে লাগিল, এবং শাশুড়ীকেও বেশ ভক্তি করিতে লাগিল। শাশুড়ীটী কি আর সংসারের প্রায় কোন কাজই করিতে হয় না, বৌমাই সব করে। তা ছাড়া, এমনি নীরবে সে কাজ করিয়া যাইত, যে পাশের বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত এই বৌটীর কোনদিন মুখের রা'টী শুনিতে পায় নাই।

* * * * *

পরশু দিন বাড়ী যাইবে, সুতরাং কাহার জন্য কি কিনিয়া যাইতে হইবে, সে

INSECT DAMAGE

রাত্রিতে শুইয়া শুইয়া রাজেন তাহাই ভাবিতে লাগিল। তাহার শীর্ণ মুখে এখন হাসি ধরে না। স্থির করিল, মায়ের জন্য ত এক জোড়া কাপড় লইতেই হইবে, আর আসিবার সময় তাঁহার 'হরি নামের ঝোলাটী ছেঁড়া দেখিয়া আসিয়াছি, সুতরাং তাঁহার জন্য একটী হরিনামের 'ঝোলা'ও লইতে হইবে। তার পর ভাবিতে লাগিল,—ছেলেদের জন্য কি রকম কাপড়ই বা লইয়া যায়! দুইটিরই রং ফর্সা, কালা পেড়ে কাপড় বেশ মানাইবে, সুতরাং তাদের জন্য এক জোড়া কালা পেড়ে কাপড় লইতে হইবে। কিন্তু স্ত্রী নারায়ণীর জন্য কি রকম কাপড় লওয়া যায়? পাছা পেড়ে লইব, না বেপাছা সাড়ী লইব? খুব চওড়া হাতীপাড় লইব, না ইঞ্চিপাড় লইব? বিলাতী ভাল হইবে কি, দেশী শান্তিপুরে কি ফরাসডাঙ্গার ভাল হইবে? এইরূপ অনেক কথাই সে ভাবিতে লাগিল। তারপর টাকার কথা মনে হইল; ভাবিয়া দেখিল, টাকার অভাব হইবে না, কারণ তাহার দুই মাসের বেতন পাওনা আছে। ২৪৲ টাকা! সে কি কম, রাজার রাজত্যি!!

পরদিন সকালে রাজেনের কেবলই মনে হইতে লাগিল, "আজকের দিনটা গেলে বাঁচি!" বৈকালে বাবুর নিকট টাকা চাহিয়া লইয়া বাজার সারিয়া—ছাড়পর, গ্রামের একটী লোকের সঙ্গে দেখা করিয়া মুর্গিহাটা দিয়া যখন ফিরিতেছিল, তখন দেখিল, কয়েকখানা সুগন্ধি তেলের দোকানের গন্ধে জায়গাটা ভরপুর। রাজেনের মনে হইল, নারায়ণীর জন্য একশিশি নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহার ভাবনা আসিল, যদি টাকায় না কুলায়! যাহা হউক, কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজেন অল্পদামী একশিশি সুগন্ধি তেল স্ত্রীর জন্য কিনিল।

রাত্রিতে রাজেন পুটুলি বাঁধিতেছে, এমন সময় সতীশ আসিয়া পড়িল, বলিল, "বাঃ—রাজেন দা,—তীর্থযাত্রী মেয়েদের মত তোমার পুটুলি ত দেখছি নিতান্ত ছোট হল না। কি এত কিন্‌লে?"

রাজেন বলিল, "ভাই একটা দুটো করতে করতে এতগুলোই হয়ে উঠলো, হাতে পথ খরচা ভাই আর কিছু নেই। এই ধর না—একখানা লোহার কড়াই কিনলাম; মা কান্ত ভালবাসেন, সেই জন্যে পাঁচপোয়া পোস্ত কিনলাম; তারপর, ফৌজদারী বালাখানার তামাকও খানিকটা নিতে হল,—বাড়ী গেলেই পাড়ার সবাই এসে বল্‌বেন, "কি হে কলকাতা থেকে এলে, ভাল তামাক টামাক কিছু এনেছ"—

এইবারে সতীশ বাধা দিয়া বলিল,—"তা বেশ, বেশ—কিন্তু কাপড় চোপড় কিনবে বলছিলে, কি কিনলে দেখি। এই বলিয়া সে পুটুলিটী খুলিয়া ফেলিল। তারপর মোটটী গুছাইয়া বাঁধিতে গিয়া একটা শিশি নজরে পড়ায় সতীশ বলিয়া উঠিল, "ও কি, রাজেন দা, একটা বাসতেলও বুঝি নিয়েছ? তাই বলি, এত বাস বেরুচ্ছে কোথা থেকে। কি তেল দেখি—"

রাজেন তাহার হাত হইতে পুটুলিটী কাড়িয়া লইয়া বলিল, "ওরে চুপ কর্ হতভাগা, ওঘরে বাবু এখনও জেগে আছেন, শুনতে পাবেন যে।" সতীশ চুপ করিল। তারপর কতকগুলো কাগজ চোখে পড়ায় আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, অত কাগজ কিনলে কেন রাজেন দা?"

রাজেন বলিল, "ভাই, বড় ছেলে কানাই পাততাড়ী ছেড়ে কাগজে লিখতে আরম্ভ করেছে, তাই তার জন্যে দু'দিস্তা কাগজ নিলাম।"

পরদিন প্রাতে সাড়ে ছ'টার সময় ট্রেণ কিন্তু রাত্রি তিনটা হইতে চার-পাঁচবার উঠিয়া রাজেন দেশলাই জ্বালিয়াছে আর দেওয়ালের ঘড়িটা দেখিয়াছে। পাঁচটার সময় আর থাকিতে না পারিয়া সতীশকে উঠাইয়া বলিল, "ওরে ওঠ্ না ভাই, এইবারে ষ্টেশনে যাওয়া যাক্।" "এত তাড়াতাড়ি কেন, যাব ত ভারী এইটুকু"—এই বলিয়া সতীশ আবার পাশ ফিরিয়া শুইল। রাজেন বলিল, "ওরে বুঝিস না, রেলের কাজ—একটু আগে যাওয়া ভাল।"

যথা সময়ে রাজেনকে ট্রেণে চড়াইয়া দিয়া সতীশ বাসা ফিরিল।

* * * * * *

রাজেন যখন রসুলপুরে নামিল, তখন বেলা প্রায় দশটা। ষ্টেশন হইতে তাহার বাড়ী প্রায় সাত আট ক্রোশ। সে প্রথমে একা মুটের চেষ্টা করিল, কিন্তু মুটে যখন কিছুতেই এক টাকার কমে নামিল না, তখন সে ভাবিল, "আমার মাইনে হ'ল মাসে বার টাকা, আমি একটা টাকা মুটেকে দিই কি করে?" এই ভাবিয়া সে নিজেই মোটটী মাথায় করিয়া, সেই কাঠ-ফাটা রৌদ্রে চলিতে আরম্ভ করিল। কথায় বলে, বাঁদামুখো বাঙ্গালী আর রণমুখো সেপাই—তা'ছাড়া রাজেন আজ ছয়মাস পরে বাড়ী ফিরিতেছে, তাহার কি আর রোদ বৃষ্টি জ্ঞান থাকে!

ক্রোশ দুই আসার পর রাজেন বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন সে মাঠের একটা পুকুরের পাড়ে বটতলায় বসিল। পুকুরে তখন দুই চারিজন বাগ্দীর মেয়ে জাল লইয়া মাছ ধরিতেছিল। বেলা বোধ হয় দ্বিপ্রহর। তাহার মনে

হইল, "এতক্ষণ হয়ত তাহার স্ত্রীর রান্না শেষ হ'য়ে গেছে, ছেলেরা পাঠশালে গেছে, আর 'সে' হয়ত মাকে খাওয়াচ্ছে, অথবা, হয়ত, দু'জনেরই খাওয়া হ'য়ে গেছে, মা শুয়ে আছেন, আর 'সে' মায়ের মাথার পাকা চুল তুলে দিচ্চে।" এই[রূ]প ভাবিতে ভাবিতে রাজেন অপেক্ষা করিতে লাগিল, যদি কোন রাখাল কৃষাণ সেদিক দিয়া যায়, তাহা হইলে সে একবার 'কড়া তামাক খাইতে পায়। কিন্তু কেহই যখন আসিল না, কখন সে তাহার পুঁটুলি খুলিয়া তামাক সাজিল এবং তাহার জলশূন্য হুঁকায় টান দিয়া তামাক খাওয়ার সাধ মিটাইল। পরে আবার চলিতে লাগিল।

আরও তিন ক্রোশ আসার পর সে একেবারে আসন্ন হইয়া পড়িল। একটা পু[কু]রে স্নান করিয়া লইয়া একটী আমগাছের তলায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিল। [আ]বার চলিল। ক্রমে সূর্য্যদেব লাল হইয়া নীচে নামিতে লাগিলেন আর পিছ[নে]র দিকে তাকাইয়া যেন বলিতে লাগিলেন, "পথিক সন্ধ্যা হয় হয়, একটু দ্রুত [গ]মন কর।" রাজেন দেখিল, আর তিন পোয়া আন্দাজ রাস্তা বাকী, গ্রামে[র] বাবুদের চিলে কোঠা দেখা যাইতেছে, তাড়াতাড়ি করিয়া আর লাভ কি? ক্রমে যখন গা-ঢাকা-ঢাকা অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন রাজেন গ্রামের বাহিবে 'রায়দীঘির' পাড়ে পৌছিল। এই দীঘির জলই তাহাদের পাড়া[র] সকলে খায়। রাজেন একটী তেঁতুল তলায় বসিল, ভাবিল, এই সময়েই ত[া]হার স্ত্রী এই দীঘিতে জল লইতে আসে, আজও আসিবে, সে এইখান হইতে [দে]খিবে। ক্রমে যখন পাড়ার বৌ ঝি সকলেই জল লইয়া গেল, অথচ তাহার স্ত্রী আসিল না, তখন তাহার ভয় হইল, অসুখ বিসুখ করে নাই ত! পরে ভা[বি]ল, বোধ হয় আজ বেলা থাকিতেই জল লইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া দীঘির [ঘা]টে পা ধুইয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। গ্রামে ঢুকিয়াই দেখিল, দূরে দয়াল ক[া]কা তাহাকে দেখিয়াই বাড়ীতে প্রবেশ করিল! পরিচিত অনেককেই সে দূর [হ]ইতে দেখিতে পাইল, কিন্তু সকলেই পাশ কাটাইতে লাগিল। কেবল যখ[ন] রাঙা পিসির সামনে পড়িয়া গেল, তখন তিনি আর পাশ কাটাইতে না পারি[য়]া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, রাজু যে!" "হাঁ পিসিমা, ভাল আছত!" বলিয়া রাজেন চলিতে লাগিল; তাহার আর কিছু বলিবার বা জিজ্ঞাসা ক[রি]বার সাহস হইতেছিল না। কেহই ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না দে[খি]য়া, এক অপ্রত্যাশিত বিপদের আশঙ্কায় রাজেনের বুক কাঁপিতে লাগিল। বাড়ীতে পৌছিয়া সে কিছুক্ষণ বহির্ব্বাটীর দরজায়

কাণ পাতিয়া রহিল, যদি কাহারও কোন কথা শুনিতে পায়। কিন্তু কি[ছুই] ভাব-
শুনিতে পাইল না। কোন্ এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হ[ৃদয়] নিজ
লইয়া উঠানে পা দিয়াই সে ডাকিল "মা।" [..]নের
কে বাবা, রাজু এলি।" বলিয়াই মা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠি[লেন।] তাই
"বাবা, বৌমা আমার নেই রে, আজ তিনদিন হ'ল মাকে আমার হারি[য়েছি] য়ুরোপ
বাবারে—।" রাজেন সেই খানেই বসিয়া পড়িল; মা কাঁদিতে ল[াগিলেন] অন্ধ
ছেলেদুটীও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কান্নার শব্দে প্রতি[বেশীরা] দেশের
আসিয়া পড়িল। তাহারা রাজনের মাকে থামাইল। রাজেন 'গুম [..] নিয়ে
বসিয়াছিল; তাহার বুকটা চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তাহার [..]ও ভাস্কর
চেঁচাইয়া কাঁদিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু চোখের জলে তাহার বুক [..] এত বড়
যাইতেছিল। অবশেষে কে একজন বুঝাইয়া বলিলেন, "যা বাবা [..] পাগলামী
আয়—সারা দিনটা খাওয়া হয়নি।" "হুঁ যাই" বলিয়া আরও [..]র, বর্ত্তমানের
করিয়া থাকিয়া রাজেন স্নান করিতে গেল। [..]াবতে হবে।
সে রাত্রিতে মা রাজনকে একলা শুইতে দিলেন না। তি[নি ..] [কি]ন্তু প্রশ্ন হচ্ছে
লইয়া এক ঘরেই শুইলেন। বলিতে লাগিলেন, "হঠাৎ সর্দ্দি হ[..] [আ]জও যে সভ্যতা
যে এত বাড়াবাড়ি হবে, বাবা তা ডাক্তারও বুঝতে পারে [নি।" ..] হনে অতীত ও
একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "এমনি [..] মাঝ পথে। পঞ্চম
তোকে না জানাতাম বাবা।" এইরূপে অনেকরাত্রি প[র্য্যন্ত ..] অনাগত শতাব্দির
অসুখের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। রাজেন বুঝিল, [..] যে পথে বর্ত্তমানের
নিউমোনিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতেই নারায়ণী মারা গি[য়াছে ..]ত্র শক্তিতে ভারতের
যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার ব্যথিত বুকে সে [..] [..]বে।
আঘাত অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল, [..] [..]মে যখন এই রকম
সে বাড়ী হইতে যায়, সেদিনও তাহার স্ত্রী জ্বরে পড়িয়াছি[ল ..] শেখান যেতে পারে
ক্ষতি হইতেছে বলিয়া বার বার তাগাদা পত্র আসায় [..] [..]ীয় বিষয় হলো শিক্ষার
রোগকাতর স্ত্রীকে ফেলিয়াই কলিকাতায় যাইতে হইয়া[ছিল।] মূল লক্ষ্য মানব মন ও
পরদিন মা যখন স্নান করিতে গেলেন এবং ছেলের[া ..] [..]ভাণ্ডান—ইচ্ছাশক্তি ও
গিয়াছিল, সেই সময় রাজেন তাহার পুঁটুলিটি খুলি[য়া ..] [..]ত্ব বা নূতন ধারার সৃষ্টিও
সাড়ীখানি ও তেলটী বাহির করিল। পরে একটা ব[..] কতকগুলো জড়বিজ্ঞানের
পুরাণো ছেঁড়া কাপড় চোপড় থাকে—তাহারই স[..] [..]করে সেইগুলো গিললেই
ভিজাইয়া সেই সাড়ীখানি রাখিয়া দিল, তার উপর [..] আমরা কি করবো, কি

INSECT DAMAGE

পড় চাপা দিল, যেন সহসা কাহারও তাহাতে চোখ না পড়ে। আর সেই লের শিশিটা খুব একটা উঁচু কুলুঙ্গীতে—যেখানে তাহার মা কোনদিন হাত না, আর ছেলেরাও নাগাল পায় না, সেই খানে তুলিয়া রাখিল। চোখের টুপ্ টুপ্ করিয়া পড়িতে লাগিল। ঘরের একপাশের একটা কুলুঙ্গীতে ন দেখিল মাথা বাঁধা ফিতে, চুলের গুছি, আর মাথার কাঁটা রহিয়াছে, একটা কাঁচের বাটীতে খানিকটা নারিকেল তেল, তাহাতে সিঁদুর পড়িয়া ছ। অন্যদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরের 'আড়ায়' একখানা হলুদের দাগ-থা ঝুলিতেছে, বোধ হয় পাড়ায় কেহ তাহার ছেলের জন্য বুনিতে নারায়ণী শেষ করিয়া যাইতে পারে নাই। আর দেখিল, দেওয়ালের র লে একখানা আয়না ঝুলিতেছে, তাহার ফ্রেমটীও সিঁদুর মাখান। টা ছোট কুলুঙ্গীতে দেখিল, একটা চাবির রিং, আর কতকগুলো হিয়াছে। চোখের জলে তাহার চোখ ভরিয়া গেল। সে আর ল না বুকের ভিতরটায় অসহ্য যন্ত্রণা হইতে লাগিল, মনে করিল ংকার করিয়া কাঁদে। ঠিক এমনি সময় তাহার বাল্যবন্ধু যুগল , "রাজেন"। রাজেন বাহির হইয়া আসিল। তারপর যুগল ভাই দু'দিন বাড়ীতে ছিলাম না,—এই মাত্র আসছি, এসেই দ—উঃ চোখ দুটো তোর যে লাল জবাফুলের মত হ'য়ে মামাদের বাড়ী" বলিয়া যুগল তাহাকে টানিয়া লইয়া

* * * *

একদিন স্নানান্তে ঘরের পিড়েতে বসিয়া রাজেন তাহার লা গাছটা নূতন করিয়া গাঁথিতেছে, এমন সময়, তাহার "বাবা, ও ঘরটায় কি ইন্দুরের দৌরাত্মিই হয়েছে। একটা কিসের বাস পেলাম—ঢুকে দেখি, একটা পড়ে রয়েছে, ঘরময় তেল ছড়াছড়ি। আহা—মা কখন তুলে রেখেছিল, বোধ হয় একদিনও মাথে নি। তাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে মাখছে—বললাম—কাঁচে হাত শোনে—! যাই দেখি গে।" বলিয়া মা চলিয়া ল, এ কোন্ তেলের শিশি! কয়েকদিন পূর্ব্বে কত গটায় এই তেলের শিশিটা কিনিয়াছিল।

হইয়া
গেছে
গেছে
এই
কৃষাণ
পায়।
সাজিল
পরে আর
আর
একটা পু
রহিল।
আর পিছে
একটু দ্রুত
বাকী, গ্রামে
আর লাভ বি
রাজেন গ্রামের
তাহাদের পাড়া
এই সময়েই ত
সে এইখান হইতে
গেল, অথচ তাহার
নাই ত! পরে ভা
এই ভাবিয়া দীঘির
দেখিল, দূরে দয়াল ক
অনেককেই সে দূর
লাগিল। কেবল যখ
পাশ কাটাইতে না পারি
পিসিমা, ভাল আছত!"
বলিবার বা জিজ্ঞাসা ক
কথা কহিতেছে না দো
বুক কাঁপিতে লাগিল।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় রাজেনের নামে একখানি চিঠি 'পিওন' গেল। তাহার মনিব দিয়াছেন, লিখিয়াছেন—'সাতদিনের ছুটী ল গিয়াছেন, আজ প্রায় দুই সপ্তাহের উপর হইয়া গেল, যত শীঘ্র পারেন, চ আসুন, কাজের বিষম ক্ষতি হইতেছে।'

রূপ কথা।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।]

সেদিন সাঁঝে খবর এল
কল্প লোকে শেষ নিশায়
বস্‌বে সভা নাচবে হাজার অপ্সরী
তারার দলে জাল্‌বে বাতি.
দীপ্ত করি' দিক্ বিভায়
গাইবে গীতি কণ্ঠে মধুর কিন্নরী।

বাহির হ'লেম কুটীর ত্যাজি'
সেদিনের সে শেষ নিশায়
রাখতে হবে অপ্সরীদের আম
দেখতে হবে কেমন তারা
কিন্নরীরা কেমন গায়
হৃদয় মাঝে জাগল এমন অ

হাজির হ'লেম কল্প লোকে
সেদিনে তাই শেষ নিশায়
মন্‌টা আমার উধাও করি
অপ্সরীদের নূপুর রিণি,
কিন্নরীদের কণ্ঠ গায়,
রঙ্গিণীদের রঙ্গ বাজে বা

ভাব-
নিজ
নের
তাই
য়ূরোপ
অন্ধ
দেশের
নিয়ে
ও ভাস্কর
এত বড়
পাগলামী
র, বর্ত্তমানের
ভাবতে হবে।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে
আজও যে সভ্যতা
হলে অতীত ও
মাঝ পথে। পঞ্চম
অনাগত শতাব্দির
যে পথে বর্ত্তমানের
তর শক্তিতে ভারতের
বে।
মে যখন এই রকম
শেখান যেতে পারে
নীয় বিষয় হলো শিক্ষার
মূল লক্ষ্য মানব মন ও
ভাণ্ডান—ইচ্ছাশক্তি ও
ত্ব বা নূতন ধারার সৃষ্টিও
কতকগুলো জড়বিজ্ঞানের
করে সেইগুলো গিললেই
আমরা কি করবো, কি

হই
গেছে
গেছে
এই
কৃষাণ
পায়।
সাজিল
পরে আ
আর
একটা
রহিল।
আর পিছ
একটু দ্রুত
বাকী, গ্রামে
আর লাভ কি
রাজেন গ্রামের
তাহাদের পাড়ি
এই সময়েই ত
সে এইখান হইতে
গেল, অথচ তাহা
নাই ত! পরে ভা
এই ভাবিয়া দীঘির
দেখিল, দূরে দয়াল ক
অনেককেই সে দূর
লাগিল। কেবল যখ
পাশ কাটাইতে না পা
পিসিমা, ভাল আছত!
বলিবার বা জিজ্ঞাসা ক
কথা কহিতেছে না দে
বুক কাঁপিতে লাগিল।

নারায়ণ।

শুধুই হাসি শুধুই গানে
রিক্ত কিছু নাই কোথায়
চৌদিকে হায় আপন-ভোলা সঙ্গীতে ;
অশ্রু এল আঁখির পাতে
বাজ্‌ল ব্যথা মোর হিয়ায়
অপ্সরীদের সেই গো একই ভঙ্গীতে।

হাসি মুখে ফিরনু ঘরে
সেদিনে তাই প্রভাত বায় :—
ভাল ভাল আমার ভাল ধরিত্রী
আমার চোখের অশ্রু জলে
ঐ যে স্বপন দেখা যায়
ভাল আমার দুঃখ-সুখ-দায়িত্রী।

ভাল ভাল আমার ভাল
এই যে প্রাণের আকুলতা
তুলনা তার কোথাও গো নাই নন্দনে
াখের জলে সুখের রেখা
সুখের মাঝে লুকিয়ে ব্যথা
সেই স-পাওয়াই জাগ্‌ছে আমার ক্রন্দনে।

সিন্ধু-সকাশে।

রাতি তোমার বুকে
-সব উঠে তরঙ্গ
কি চায় তারা ? কি গায় তারা গান ?
তি পরাণ মেলি
র গায়ে অনন্ত
কি পায় তারা ? কি চায় তারা দান ?
র ব্যাকুল ওরা
ল কিসের জল্পনা
ফুট্‌ছে ওদের গভীর হিয়ার তলে ?

কাহায় নিয়ে ওদের খেলা
কিসের বিপুল কল্পনা
ওদের জীবন-পথটী ছেয়ে চলে ?

গভীর ওদের বুকের তলে
যেথায় শীতল শান্ত গো
সেথায় কিসের স্বপ্ন দেখে ওরা ?
অতল তোমার কোনের কাছে
পৃথ্বী যেথা ক্লান্ত গো
কার পরশে ঘুমিয়ে জাগে ওরা ?

আমার কানে ওদের বাণী
ওদের চির মূর্চ্ছনা
প্রাণের কবাট আল্‌গা করে' যায় !
দিবস রাতি সে এক মোহ
সে এক আকুল প্রার্থনা
মনের বনে চির নূতন গায় !

আমার প্রতি শিরায় শিরায়
ঢেউয়ের মতোই নৃত্য রে
ওম্‌নি কে যে হাজার ফণা তুলি'
অনন্ত ঐ নভের গায়ে
বিপুল কাহার বিত্তে রে
জীবন নিয়ে উঠ্‌তে চাহে ফুলি

জীবন-পথে আমার বুকে
ওম্‌নি হাজার ঢেউ খেলে
ওম্‌নি হাজার ভাব্‌-লহরী ন
যাত্রাপথে মুখর করি'
জল-তরঙ্গের রাগ ঢেলে
কে কয় ডাকি,—"আছি আ

ভাব-
নিজ
বুনের
তাই
য়ুরোপ
অন্ধ
দেশের
নিয়ে
ও ভাস্কর
এত বড়
পাগলামী
র, বর্ত্তমানের
ভাবতে হবে।
ন্ত প্রশ্ন হচ্ছে
আজও যে সভ্যতা
হবে অতীত ও
মাঝ পথে। পঞ্চম
অনাগত শতাব্দির
যে পথে বর্ত্তমানের
তর শক্তিতে ভারতের
লবে।
মে যখন এই রকম
শেখান যেতে পারে
ক্ষণীয় বিষয় হলো শিক্ষার
মূল লক্ষ্য মানব মন ও
ভাণ্ডার—ইচ্ছাশক্তি ও
ত্ব বা নূতন ধারার সৃষ্টিও
কতকগুলো জড়বিজ্ঞানের
করে সেইগুলো গিললেই
আমরা কি করবো, কি

হইা
গেছে
গেছে
এই
কৃষাণ
পায়।
সাজিল
পরে আ
আর
একটা পু
রহিল।
আর পিছে
একটু দ্রুত
বাকী, গ্রামে
আর লাভ বি
রাজেন গ্রামের
তাহাদের পাড়
এই সময়েই ত
সে এইখান হইতে
গেল, অথচ তাহার
নাই ত! পরে ভা
এই ভাবিয়া দীঘির
দেখিল, দূরে দয়াল ক
অনেককেই সে দূর
লাগিল। কেবল যখ
পাশ কাটাইতে না পারি
পিসিমা, ভাল আছত!
বলিবার বা জিজ্ঞাসা ক
কথা কহিতেছে না দে
বুক কাঁপিতে লাগিল।

সেই ডাকেতে পাগল আমি
তরঙ্গদের মতোই ধাই
এদিক সেদিক দিবস-রাতিমাঝে
দুঃখ সুখের মাঝে আমার
তাইত সদা শুন্‌তে পাই
পাগল-করা আনন্দ-গান বাজে!

সে-গান শুধুই শুন্‌ছি আমি
আর তোমার ঐ তরঙ্গ
আর পৃথিবীর কেউ ত জানে না!
আর বাগানের কোমল কলি
আর কাননের বিহঙ্গ
আর ভবে কেউ সে-সুখ মানে না!

হায় রে কবে আমার মতো
সবাই হবে পাগল রে
পাগল যেমন তোমার বুকে তরঙ্গ
দিবস রাতি সবার বুকে
বাজবে না আর আগল রে
আগল বিহীন কেমন বনের বিহঙ্গ!

সেদিন তোমার ঐ লহরী
ওম্‌নি সবার বক্ষে রে
উঠবে নাচি' বিলিয়ে মোহ অনন্ত
সুখের সুরে সুরে
লাগবে নেশা চক্ষে রে
বিপুল ধরায় রইবে শুধুই আনন্দ!

বুদ্বুদ।

[শ্রীসত্যবালা দেবী।]

(১)

জাগো শক্তি স্বরূপিনী,—বাংলার আত্মা তোমাদের বোধন করিতে তোমাদেরই রসে প্রাণ পাইবে তাহার অন্তর্গূঢ় নিবিড় ইচ্ছাশ তোমরাইত' রূপ দিবে এই উদীয়মান জাতিকে।

* * * *

(২)

আজ ভাগবৎ প্রবাহ আধারের সকল রন্ধ্র পরিপূর্ণ করিয়া অত জলরাসির মত থিতাইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারই মধ্যে প্রতিবিম্ব তোমার,—নারী! দেখিলাম অনন্ত সম্ভাবনা। দেখিলাম ঘূর্ণ্যমা কোথার কি কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

* * *

(৩)

তোমার যতখানি মানুষ জানিয়াছে,—সে সামান্য মাত্র। আপনি জানিয়াছ সেও অতি সামান্য। তোমার পরিপূর্ণতা জানিতে পারে না। নির্ণয় নিরূপণের মধ্যে তোমার অ হইবার নয়। বুদ্ধি কি করিবে,—সে যতই সূচ্যগ্র হউক ত ও জড়ের মধ্যেই। তোমার সমস্ত সম্ভাবনা যদি কোথা সে আনন্দের মধ্যে। আত্মাই তাহার বোদ্ধা।

* * *

(৪)

ওগো লক্ষী, তোমার যে ঘর সেথায় কোনও সীমা সে বৈকুণ্ঠ, সকল কুণ্ঠা লয় পাইবার স্থান। সেথাকা জগতের স্থিতি?—যদি এই মরণোন্মুখ জাতিকে রাখি এই সকল সত্য,—শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের তর্ক মিটিয়া যাইবে।

* * *

ভাব-
নিজ
নের
তাই
য়ুরোপ
অন্ধ
দেশের
নিয়ে
ভাস্কর
এত বড়
পাগলামী
র, বর্ত্তমানের
ভাবতে হবে।
প্রশ্ন হচ্ছে
আজও যে সভ্যতা
হলে অতীত ও
মাঝ পথে। পঞ্চম
অনাগত শতাব্দির
যে পথে বর্ত্তমানের
তর শক্তিতে ভারতের
বে।
মে যখন এই রকম
শেখান যেতে পারে
ক্ষণীয় বিষয় হলো শিক্ষার
মূল লক্ষ্য মানব মন ও
ভাগান—ইচ্ছাশক্তি ও
ত্ব বা নূতন ধারার সৃষ্টিও
কতকগুলো জড়বিজ্ঞানের
করে সেইগুলো গিললেই
আমরা কি করবো, কি

(৫)

আত্মা অমর তাহার মধ্যে ভয়ের স্থান নাই বলিয়া। যেখানে ভয় সেখানেই সঙ্কোচ, – তাহাই মৃত্যু। এই মৃত্যুই জগৎকে গড়িয়া তুলিয়াছে। আত্মানং বিদ্ধি। নতুবা তুমি সংসারকে অতিক্রম করিবার শক্তি পাইবে না।

* * * *

(৬)

নূতন আসিতেছে তুরীয় লোক হইতে জীবনবাণী আহরণ করিয়া। সে সংসারেরই মৃত্যুহীন রূপান্তর। তাহাকে আবাহন কর নারী তোমারাও, ...রের পারে গিয়া। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, আমি জানি সে ...মাতে আছে।

* * * *

(৭)

বিশ্বস্ততাই পুরাতনের বনীয়াদ অথচ পুরাতনের চক্ষে সে নরকের ...রই নাম প্রকৃতির পরিহাস।

* * *

(৮)

...দিতে পারে এখনও দিয়া উঠিতে পারে নাই,—তোমায় পায় ...রী। গতানুগতিক বিধানে তাহাদের চরণে তোমার অনন্ত ...র দাস্যে, তাহারা এতদিন, কেবল, তোমার মধ্য দিয়া ...কেই পাইয়াছে।—তোমাকে নয় তোমাদের সত্যটা তাহারা ...তেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাদের সত্যটাও তাহারা ...ক তোমরা আকর্ষণ করিয়া আনিবে আপনাপন সত্য ইহাই অমোঘ ভাগবত বিধান।

...নূতনের প্রতিষ্ঠা হইবে। মিথ্যার সহিত আপোষে নহে।

* * *

(৯)

...আপনার নহ। এই মন্ত্র তোমার অজপা হউক।

* * *

(১০)

আজ মাতৃত্ব ভগিনীত্ব সতীত্ব সমস্তেরও উপর স্থান পাক—ধর্ম্ম। নারী মুছিয়া যায় যাক, যদি সে সত্যের প্রকাশের অন্তরায় হয়।

* * * *

(১১)

নারীয় সত্য স্বরূপে তাহার স্থান জগতে সর্ব্বোচ্চে। যুগে যুগে সে নিম্নে তাহার কারণ তাহার মধ্যে প্রকৃতি প্রবলা। আত্মা তন্দ্রামগ্ন।

আপনাকে স্বচ্ছ করিলেই সকল নির্দ্দেশ আপনার মধ্যে পা... কাহারও শরণ লইতে হইবে না।

* * * *

(১২)

নারীর জন্য যে প্রেরণা সে নামিয়া আসে জ্ঞান হইতে হৃদয়ে। ... জন্য যাহা তাহার পথ জ্ঞান হইতে মস্তিষ্ক। তাই শাস্ত্রকার পুরুষের ...

নারী শাস্ত্র মানিতেছে বাহিরের শাসনে। পুরুষ কাব্যে... লইতেছে ভিতরের কষাঘাতে! কিন্তু একদিন উভয়েই মুক্ত হইবে ...

* * *

(১৩)

যার ভয় আছে তারই বুদ্ধি আছে। ভয় নাই যার তা... যাহা আছে তাহা অব্যক্ত পদার্থ,—সে বস্তু সর্ব্বজয়ী। তাহাই অমর হইতে বাসনা থাকে,—অন্বেষণ কর। অন্বেষণ কর।

* * *

(১৪)

নারীর মধ্যে এমন একটা গতিবেগ আছে যেটা সমগ্র ... করিয়া দিতে পারে। আকুঞ্চণের দিনে মৃত্যুর জড়তা ত... শিকলে বাঁধিয়া রাখে। সম্প্রসারণের যুগ সে নিগড় ভা... অন্তরে যদি কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে সে এই নিয়... হইয়া উঠে ত বুঝিব দুর্দ্দশার যুগের অবসানে আকুঞ্চনে... হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরাই যদি এ যুগের প্রবর্ত্তন... এমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুর সর্ব্বাগ্রে আস্বাদ ক... উঠিলে জগতের জীবনকোষ সম্পূর্ণ পরিণতি পাইবে।

জাতীয় শিক্ষার গৌরচন্দ্রিকা। *

[শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।]

আচণ্ডালে বিত্তে দান এটা আজকালকার শিক্ষিতের কাছে একটা ধুয়া
গোঁড়ামীতে দাঁড়িয়েছে। যে একটু উদার প্রাণ—যার মনই জাতের কল্যাণে
গছে সেই এ বস্তু চায়। প্রাণ শক্তির গড়া মানসিক উন্নতির এই পুরাণ
তায় বিত্তা যে কতক অভাব ঘোচায় তা' এক রকম ধরে নেওয়া যেতে
কিন্তু আসলে শিক্ষা যে কি—শিক্ষার সব চেয়ে বড় আদর্শ কোন্‌টা
বিষয়ে একটা চূড়ান্ত জ্ঞানকারুর মনে নেই। শিক্ষার সম্বন্ধে একটা
ত হয়ই নি, তার ওপর বিধির বিড়ম্বনায় দেশে ফৈরঙ্গী আর দেশী
ধারার এই জবরদস্তি মাথা-ঠোকাঠুকি চলছে, এসিয়া আর
একেবারে বিপরীত জ্ঞান ও সভ্যতার মারমুখো রণ লেগেই আছে।
? রাজদণ্ড বা শাসনের শ্রীকোঁৎকা বিদেশীর হাতে থাকায় শিক্ষা-
আর হাল রাঙা হাতেই ধরে রয়েছে। এই সব বিপদের ওপর আবার
ওয়ায় হঠাৎ আমাদের জাগরণ আর জাতীয় শিক্ষার কোলাহল।
বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থায় মহা গণ্ডগোলে পড়ে গেছে।

যে কি বস্তু বা কি রকম হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধেই একটা
তার ওপর জাতীয় শিক্ষা বলতে যে কি বুঝি সে জ্ঞান তো
কেবল এইটুকু সবাই মনে প্রাণে বুঝতে পেরেছে যে, আজ-
র বিশ্ববিত্তালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা' খারাপ, তা'তে
য় মন ও আত্মার জাত মেরে অধোগতি পাইয়ে আত্মঘাত ঘটায়,
দেওয়া বিত্তেয় আছে বিদেশী গন্ধ, বিদেশী ছন্দ, বিদেশী মাল
বিদেশী প্রাণ। এ বিত্তেয় চলবে না—আমাদের আন্দোলনের
য় একরায় হ'লেও আমাদের উপায় হবে না। কথা হচ্ছে,
দ্যের জায়গায় আদর্শতঃ আর কার্য্যতঃ কোন ভাল শিক্ষার
টা নামে মন্তরের বল থাকতে পারে, কিন্তু একটা স্কুলে বা
কাঁসিলের গায়ে "ন্যাশনাল" নামটা জুড়ে দিলেই চলবে

* on National Education—Arya. অনুবাদ।

না; যে বিদ্যের আমরা নিন্দা করছি, সেই বিদ্যের মানুষ হয়েছে এমনতর ভাব-
স্বদেশী এজেন্সীর হাতে ভার দিলেও চিঁড়ে ভিজবে না; সেই পুরোণো পদ্ধতি নিজ
টাকে ছেঁটে কেটে আর তাতে কিছু জুড়ে তেড়ে বইগুলো বদলে আর তার
ল্যাজে একটা টেক্‌নিকাল ক্লাস জুতে দিয়ে এ সমিস্তের নিব্বংশও হবে না আর তাই
তা'তে শিক্ষার পরিবর্ত্তনও হবে না। এ রকম একটা হাত সাফাই দেখিয়ে
কিস্তিমাৎ করতে যাওয়া আর গম্ভীরভাবে উল্টো ডিগবাজী খেয়ে আগে যেখানে
ছিলাম, সেইখানেই পড়ে ভাবা যে আর একটা নতুন মুল্লুকে গিয়ে পড়েছি
একই কথা। এ বুজরুকী অচল! এই সব নতুন পাঠশালে শিক্ষা ভাল হ
কি না হচ্ছে, সে কথা আলাদা; কিন্তু এ শিক্ষার কোন্‌খানটা জাতীয়,
হ'লো গিয়ে প্রশ্ন।

জাতীয় শিক্ষার সমস্যা বড় জটিল, বড় দুরূহ। ঠিক কোন্ চি
হাতে কলমে কাজটির কোন্‌খানে আরম্ভ করতে হবে, শিক্ষায় নবীন
আদর্শের ভিতে উঠবে, এ ইমারৎ কোন নক্‌সায় গড়বে ভাল, এই
সমস্যা। যা' গড়তে যাচ্ছি তা' একেবারে আনকোরা নতুন জিনিস,
গড়বো সেখানে এক অরণ্য সাফ্ করে নগর বসাতে হবে। আমাদের
আমলের একটা কিছু পুরাতন অস্থি টস্থি টেনে এনে দিলেই তা' জাতী
এককালে যা' চলেছিল এবং যাতে এ জাতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছি
যুগে বাঁচান আর বাজারে চালান দুষ্কর। এই বর্ত্তমানের নতুন জী
অভিযোগ আর আমাদের প্রকাণ্ড গৌরবমাখা ভবিষ্যতের সব ক্ষুধ
পুরাণ ক্ষুদে পুরবে না। এটা যেমন এদিকের কথা তেমনি
ইংরাজী জার্ম্মাণ বা মার্কিন বিত্তা-পদ্ধতি নিয়ে তার ওপর দেশী
চড়িয়ে ও চালিয়ে দিলে অনেক চিন্তা ও চেষ্টা চরিত্রের দায় থেকে
পারি—একটা প্রণকাড়া গোছের নতুন পঞ্চরঙ ব্যাপার খাড়া
কিন্তু তা'তেও কূল পাবে না। তা' হলেই যদি হতো তবে "
কারে এ হট্টগোলের একটা কোন অর্থই থাকে না, দেশী পরি
নতুন ধরণের বই বেছে নিয়ে জার্ম্মাণী শিক্ষা দিলেই হয়! অ
যা খুঁজ ছি তা এর চেয়ে বড় জিনিস—ঢের গভীর করে তা
তাকে রূপ দেওয়া কঠিন হ'তে পারে, কিন্তু তাই আমরা খুঁজ
জাতি-আত্মা—ভারতের প্রতিভা—ভারতের মন ও ধারা
শুধু অতীতের রঙের ছবিই হলে চলবে তা' নয়, তা,

হইল
গেছে
গেছে
এই
কৃষাণ
পায়।
সাজিল
পরে আ
আর
একটা পু
রহিল।
আর পিছে
একটু দ্রুত
বাকী, গ্রামে
আর লাভ বি
রাজেন গ্রামের
তাহাদের পাড়ো
এই সময়েই ত
সে এইখান হইতে
গেল, অথচ তাহার
নাই ত! পরে ভা
এই ভাবিয়া দীঘির
দেখিল, দূরে দয়াল ক
অনেককেই সে দূর
লাগিল। কেবল যখ
পাশ কাটাইতে না পারি
পিসিমা, ভাল আছত!
বলিবার বা জিজ্ঞাসা ক
কথা কহিতেছে না দে
বুক কাঁপিতে লাগিল।

হওয়া চাই যা' ভারতের ভবিষ্যতের যত সাধ আশা—ভারতের দিনে দিনে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর জীবনের এই ভাবী আত্ম-সৃজনের অনুকূল হয় আর ভারতের চিরন্তন প্রাণের সত্য হয়। একটী আমাদের মনে জ্ঞানে বেশ স্পষ্ট করে নিতে ...বে; এই শিক্ষার মূলের খুব সুদৃঢ় ভিত্তি রচলে তবে ত তার ওপর আমরা ...শাল ও মহান করে সৃষ্টি আরম্ভ করতে পারবো। তা' না করে যে কোন ...দিকে একটা ভ্রান্তির পেছনে ছুটে পড়া অতি সহজ, শুনতে ও বলতে বেশ; ...রা একটা যা' হোক রব তুলে এরকম মেঠো কাঁটা পথে বেরিয়ে পড়লে ...চলতে আমরা গিয়ে পড়বো খানায় ডোবায় কি নালায় তার ঠিক ...ব না।

...তীয় শিক্ষা বলতে গোড়ায়ই একটা প্রকাণ্ড কথাকাটাকাটির কারণ হয় ... যে, শিক্ষা হ'লো একটা সঙ্কীর্ণ ব্যাপার,—তা' বড় জোর দেশবাসীকে ...র্ত্তব্যই না হয় শেখায়, শিক্ষার মাঝে আবার এ দেশ প্রীতির অনধিকার ...? গোড়ায় এই প্রতিবাদের হয় নিরসন করা দরকার, নয় এর ...টুকু সত্য আছে তা দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। এই দল বলেন ...তির কর্ত্তব্য কি পাশ্চাত্য, কি প্রাচ্য কি ইংলণ্ড কি জার্ম্মানী কি ...ারত সব জায়গায়ই নাকি এক, তা' শেখাবার জন্যে তাই আলাদা ...র দরকার নেই। মানুষ যখন সর্ব্বত্রই এক এবং সত্য ও জ্ঞানের ...দেশ নাই, সে হিসাবে শিক্ষাও সুতরাং বর্ণ গোত্র ও ভৌগলিক ...র্ব্বভৌম জিনিস হওয়া দরকার। এই ধর জড়বিজ্ঞানে আবার ... হতে পারে! জড় বিজ্ঞানের জাতি কোথায়? আমরা কি ...বদ্দিবুড়ী ভাস্কর আর্য্যভট্ট ও বরাহমিহির ধরে বসে থাকবো ...হয়েছেন সেই গ্যালিলি ও নিউটন থেকে আজ অবধিকার এই ...ছেড়ে দেব? কিম্বা ল্যাটিন গ্রীক অথবা অন্য য়ুরোপের ভাষা ...তিতেই বা জাতীয় হিসাবে কি তফাৎ হতে পারে। তা' হ'লে ...তন টোলের ব্যবস্থায় ফিরে যেতে হ'বে কিম্বা নালন্দ বা ...া বিধান ছিল তা' যদি আবিষ্কার করা যায় ত তাই ধরে ...না হয় বড় জোর দেশের ভাষায় শিক্ষাই দেওয়া যেতে ... একটা গৌণ ব্যাপার second language করে রাখা ... করে অতীত ভারতের ব্যাপারের যত ইতিহাস শিক্ষাই ... কিন্তু তা'তেও কথা আছে; যে বিংশ শতাব্দীর যুগে

আমরা আছি সে যুগে আবার চন্দ্রগুপ্ত বা আকবরের ভারতকে বাঁচিয়ে ভোব-কঠিন হবে, জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বর্ত্তমান জ্ঞান সভ্যতা ও ধনিজ ...নের সঙ্গে নাড়ীর যোগ না ছিঁড়ে হালফ্যাসানি হয়েই যে আমাদের বাঁচতে হবে।

এ সব যুক্তি-বাণ তখনই সন্ধান করা চলে যখন জাতীয় শিক্ষা ...তাই অতীতের ধুয়া ধরে পেছু হটেই চলেছে, কেবল সেই রূপ সেই বিগ্রহ য়ুরোপ চেষ্টাই করছে যা' একদিন ভারতের জীবন ধন থাকলেও এখন কাল ... অন্ধ মরে আসছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষা বলতে তা' তো আমরা বুঝছি নে। দেশের জীবন-ধারা এখন যেমন রেল বা মটর ছেড়ে পুরাণ রথ বা গরুর গা... নিয়ে চলতে পারে না, তেমনি আমাদের নতুন জীবনের জীবন্ত জাতীয় শিক্ষা ও ভাস্কর পণ্ডিতের অঙ্ক বা জ্যোতিষ শাস্ত্রে কি নালন্দে ফিরতে পারে না। এত বড় আন্দোলনের কোথায়ও পুরাণ ভারতকে ফেরাবার ওরকম উদ্ভট চেষ্টা ... পাগলামী থাকলেও থাকতে পারে; কিন্তু সমস্ত প্রেরণাটির সুর তা'ত নয়, বর্ত্তমানের জীবন্ত জাগ্রত শক্তির ঘর যে জাতি-আত্মা, আমাদের তার কথা ভাবতে হবে। সে হিসাবে এ প্রশ্ন তো অতীত বা বর্ত্তমানের ফল নিয়ে নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে বিদেশী আমদানী করা সভ্যতা ও ভারতের মন ও প্রকৃতি আজও যে সভ্যতা রচনার শক্তি ধরে সেই দুই সভ্যতা নিয়ে! আমাদের রচনা হবে অতীত ও বর্ত্তমানের মাঝ পথে নয় কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের মাঝ পথে। পঞ্চম শতাব্দিকে ফিরে আনার আবশ্যক নেই, আবশ্যক হচ্ছে বহু অনাগত শতাব্দির জন্ম দেওয়া; পেছুহটা আদৌ নয়—এগিয়ে পড়া সেই পথে যে পথে বর্ত্তমানের এই কৃত্রিম মিথ্যা নকলের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ভারতের শক্তিতে ভারতের প্রাণ তার অন্তর্নিহিত লক্ষ্য প্রেরণা ও সিদ্ধিকে জাগিয়ে তুলবে।

জাতীয় শিক্ষার বিরুদ্ধে এই সব যুক্তি তখনি আসরে নামে যখন এই রকম একটা ধারণা মানুষকে পেয়ে বসে যে শুধু কি কি বিষয় শেখান যেতে পারে তারই একটা তালিকার নাম জাতীয় শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয় হলো শিক্ষার বহু প্রকার উপায়ের একটা উপায় মাত্র; জাতীয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য মানব মন ও আত্মার শক্তি গড়ে তোলা—তার জ্ঞানের ঘুম ভাঙান—ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞাননাড়ীর বোধন ঘটান, যাতে সে নূতন জ্ঞান নূতন তত্ত্ব বা নূতন ধারার সৃষ্টিও করতে পারে এবং তা গ্রহণও করতে পারে। যদি কতকগুলো জড়বিজ্ঞানের কথা হজম করাই উদ্দেশ্য হ'ত, তা' হ'লে যা হোক করে সেইগুলো গিললেই চলতো। কিন্তু তা' তো নয়; এ জড়বিজ্ঞান নিয়ে আমরা কি করবো, কি

হইয়া

গেছেয়ে বিজ্ঞানীর মন ও নব নব তত্ত্ব উদ্ভাবনের শক্তি পাওয়া যাবে তাই হ'লো গেছেল কথা। ভারতের মন ভারতের নিজের পথে মুক্তির আনন্দে নূতন উদ্ভাবনের এই সৃষ্টি করবে—জড় বিজ্ঞানকে নূতন রূপ দেবে সে কথা না হয় আপাততঃ কৃষাণ দিলাম। যখন মানব মনের অন্য উচ্চাঙ্গের শক্তির কথা বলবো পায়। আমাদের মেধা ও প্রকৃতির আরও ভাস্বর ও আরও শক্তিদায়ী স্যাজিল র কথা বলবো তখন না হয় সে নবীন সৃষ্টির কথা বলা যাবে; সেই খানেই কিন্তু ভারতের মনের প্রকৃত ছাঁচ তার চিরন্তন গতি তার পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত শক্তি জ্ঞান ও প্রতিভা—তার গূঢ় অন্তর ধারার (culture) সবটুকু পরিচয় রয়েছে। সংস্কৃত বা যে কোন ভাষা শিখতে গেলে অতীত শিক্ষা প্রণালী ধরে শিখলেই চলবে না, যে উপায়ে সহজে স্বাভাবিক পথে মনের অনুশীলন করে কি করে ভাষা শেখা যায় সেই প্রণালীই নিতে হ'বে। সংস্কৃত ও আর অন্য মাতৃভাষা কি ভাবে শিখলে তাদের সাহায্যে জাতীয় ধারার (culture) প্রাণ ও নিজস্ব মর্ম্ম খুঁজে বার করা যায়। আজও এ জাতির বুকে অতীতের যা' কিছু জীবন্ত আছে আর ভবিষ্যতের সৃষ্টির জন্য যত শক্তি জাগবার অপেক্ষায় ঘুমিয়ে আছে সেই দুই বিদ্যুল্লতাকে কি যোগে কি বাঁধনে যুক্ত করা যায় এবং ইংরাজি ও অন্যান্য বিজাতীয় ভাষাই বা কোন্ পথে শিখে কি ভাবে ব্যবহার করলে অপরাপর দেশের জীবন ভাব ও ধারার আলোয় আপন জীবন গুছিয়ে নিয়ে চারিদিকে জগতের সঙ্গে মিলনসূত্র গড়ে তোলা যায় সেইগুলি হ'লো জাতীয় শিক্ষার মূল কথা। জাতীয় শিক্ষা মানে বর্ত্তমানকে মুছে ফেলা নয় কিন্তু আমাদের নিজের মনে নিজের আত্মায় নিজের অন্তর দেবতার ভিত্তি করে জীবনবেদ রচনা করাই জাতীয় শিক্ষা।

জাতীয় শিক্ষার প্রতিপক্ষ দল আর একটা যুক্তি স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেন, যে, পাশ্চাত্য সভ্যতাই আমাদের শিখতে হ'বে. আমাদের বাঁচবার কোন পন্থাই নাই আর তাই শেখবার উপায়ই প্রকৃত শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষার আদর্শ এই ধারণার স্বতঃসিদ্ধত্বকেই অপ্রমাণ করতে চায়। প্রতীচ্য থেকে—মিশর, চ্যালডিয়া, ফিনিশিয়া ও ভারত থেকে ভাব নিয়ে ভিত রচনা করে তার ওপর য়ুরোপ নিজের সভ্যতা গড়েছে, প্রতীচ্যের সেই ভাব-ধন গ্রীস ও রোমের প্রতিভায়—তাদের প্রকৃতিগত গুণে সামজিক মন ও প্রেরণায় আর তাদের জীবন ভঙ্গীতে আর এক রূপ ধরেছিল, সে যুগে য়ুরোপ কিছুকাল প্রতীচ্যের ভিত্তিটি হারিয়ে ফেলেছিল, কিন্তু আবার আরব জাতির স্পর্শে তুর্ক ইরাণ আদি দেশ ও ভারত

থেকে নতুন প্রেরণা পেয়ে, বিশেষতঃ Renaissanceএর যুগে হারাণ ভাব-সম্পদটি আবার ফিরে নিয়ে টিউটন ল্যাটিন কেল্টিক ও শ্লাভ জাতিরা নিজ নিজ প্রতিভায় মন প্রাণ ও সমাজ গতির বলে সে সম্পদকে নতুন করে জীবনের অনুকূল রূপ দিয়ে নতুন সৃজনে সৃষ্টি করে নিয়েছে। এই রকমে গড়া সভ্যতাই যেন মানবজাতির উন্নতির শেষ কথা এই বলে সেটিকে এতদিন য়ুরোপ জগতের সামনে তুলে ধরেছিল। কিন্তু এসিয়ার জাতিরা তা' কেন ও-ভাবে অন্ধ অনুকরণে গ্রহণ করবে? তার চেয়ে ভাল করে সার্থক করে নেবার পথ যে রয়েছে; য়ুরোপ যা' কিছু নূতন ও সত্য জ্ঞান দিতে পারে তা' নিয়ে নিজের ধারায়—cultureএ ও জ্ঞানে মিশিয়ে এসিয়ার প্রকৃতি প্রতিভা ও সমাজ প্রেরণায় নূতন করে অভিনব জীবনবেদ সৃষ্টির দ্বারা মানবের ভবিষ্যৎ সভ্যতা এসিয়াই গড়ে দেবে না কেন? য়ুরোপে এই জড়বিজ্ঞানের বস্তুতান্ত্রিক বৈশ্য-প্রাণ অর্দ্ধ-গণতান্ত্রিক সভ্যতা যে য়ুরোপেই ভেঙে পড়ছে, সে বাঁলির বাঁধন ধসা ফোঁপরা ভিতের উপর অন্ধের মত আমাদের জীবন-ইমারত গড়ে তোলা যে বদ্ধ পাগলামী। য়ুরোপের এই রক্ত-সন্ধ্যায় যখন য়ুরোপেরই বড় বড় প্রাণগুলি নূতন আধ্যাত্মিক সভ্যতার জন্য এসিয়ার প্রতিভার দিকে মুখ ফেরাতে আরম্ভ করেছে, তখন আমরা নিজের অন্তর-নিহিত এত শক্তি ছেড়ে দিয়ে য়ুরোপের ধসা মরা অতীতকে লতার মত জড়িয়ে থেকে আত্মঘাত করবো কেন?

আর সব শেষে এই প্রতিবাদী দলের মোক্ষম অব্যর্থ যুক্তি এই হয়ে দাঁড়ায়, যে, দুনিয়া জুড়ে যত মানুষ আছে সবার মন মূলতঃ একই আর এক কাঁচি কলে ফেলে অর্ডার মাফিক তাদের একই মাপে কেটে ছেঁটে নেওয়া যায়। আমাদের মনের যুক্তির এই পুরাণ কুসংস্কারটা এবার ছাড়বার দিন এসেছে। কারণ মানবজাতির অখণ্ড আত্মার সেই একত্বের মাঝে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত আত্মাগুলি জনে জনে তাদের সমধর্ম্মনিয়ে আবার তা লক্ষ বৈষম্য ভেদ ও অনির্ব্বচনীয়তা নিয়েও বিরাজ করেছে আবার অখণ্ড মানবজাতি আর ব্যক্তির মাঝে কত শত জাতি-আত্মা (nation-souls) তাদেরও জাতিগত অভিনবত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা এই তিনটি আত্মারই জীবনের অনুশীলন বিষয়ে লক্ষ্য রাখবে, তবেই তা কৃত্রিম একটা কিছুতে পরিণত হবে না, তবেই তা' মানুষের আত্মার ও মনের প্রকৃত শক্তি গড়তে পারবে আর যা সুপ্ত আছে তাকে জাগিয়ে দেবে। জাতীয় শিক্ষা এই হিসাবেই মানুষের জীবনবেদ।

নিকুঞ্জে।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক এম্-এ।)

১

সখি আজিকে প্রভাতে ভানুর কিরণ কিলাগি উজল কত ?
দেখ আজ কেন ওই মালতি-মুকুল ফুটিয়া উঠিছে যত ?

২

সখি কিলাগি-আজিকে বিহগের গান উঠিছে নূতন রাগে ?
আর পাপিয়ার তান সুহাস ললিত ওই যে কাননে জাগে !

৩

দেখ শত বরষের জীর্ণ তরু শাখা সহসা শ্যামল কেন !
হের শুষ্ক ভূপতিত ওই মাধবিকা শিহরে সজীব যেন।

৪

আজ ডালে ডালে বসি কোকিল-কোকিলা প্রণয়ের গাথা গায় ;
আর সুমন্দ অনিল গোপন বারতা কি যেন শুনায়ে যায় !

৫

তাই ছুটিছে রাধার রুদ্ধ অনুরাগ শ্যাম বঁধুয়ার লাগি ;
তাই শত বিরহের সুপ্ত অভিলাষ সহসা উঠিছে জাগি !

৬

সখি সেই কতদিন কানু চলি গেছে পায়ে ঠেলি অভাগীরে;
আর সেই কতদিন দিবস যামিনী ভাসে রাধা আঁখিনীরে !

৭

তবে আজ কি সজনি দুখ অবসান ?—আজ কি-লো এলো ?
ন'লে হেন সে মাধুরী নিরানন্দ গেহে কি হেতু উদয় ভেল !

৮

—শোন ওইলো সজনি বাঁশরীর তান ! ওই যে এসেছে কালা ;
দেখ মাতায় নিকুঞ্জে ত্রিভঙ্গ মূরতি,—গলে দিয়ে বনমালা !

৯

সখি এসেছে রতন ! কাজ নাই মানে ; ডাকে মোর শ্যামচাঁদ !
আমি পড়ি গিয়ে পায় !—রাধার পীরিতি না-মানে সরম বাঁধ !